দীপু নাম্বার টু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল



ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে দীপুর হঠাৎ খুব খারাপ লাগল। প্রতি বছর ওর নতুন জায়গায় নতুন স্কুলে গিয়ে নতুন ক্লাসে ঢুকতে হয়। মোটামুটি ভাল ছাত্র সে— ফার্স্ট না হলেও পরীক্ষায় সেকেণ্ড থার্ড হয় সহজেই। অথচ বরাবর ওর রোল নাম্বার হয় সাতচল্লিশ না হয় আটান্ন। নতুন স্কুলে গেলে রোল নাম্বার তো পেছনে হবেই। রোল নাম্বারের জন্যে ওর তেমন দুঃখ নেই কিন্তু নিজের স্কুলে নিজের বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে নতুন জায়গায় অপরিচিত ছেলেদের মাঝে হাজির হতে ওর খুব বিচ্ছিরি লাগে। অথচ দীপুর প্রতি বছরই তা করতে হয়— ওর আব্বা শুধুমাত্র ওর জন্যেই নাকি এক বছর অপেক্ষা করেন, না হয় কোথাও নাকি তার তিন মাসের বেশি থাকতে ভাল লাগে না। পৃথিবীর সব কয়টা আব্বা একরকম অথচ ওর আব্বা কেমন করে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেলেন দীপু এখনো বুঝে উঠতে পারে না।

ক্লাসটা বড়। দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায় হাজার হাজার মাথা— কুচকুচে কালো চুলের নিচে চকচকে চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। দীপু লক্ষ করে দেখেছে প্রথম দিন ওর বরাবরই মনে হয়, ক্লাসে হাজার হাজার ছেলে, পরে কেমন করে জানি কমে আসে। ক্লাস টিচারকে দেখে ওর ভয় হল। বদরাগী চেহারা, রেজিস্টার খাতা খুলছেন রোল কল করার জন্যে। দীপু দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, আসতে পারি?

চোখ না তুলে বদরাগী ক্লাস টিচার ভারি গলায় বললেন, না।

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল আর দীপু থতমত খেয়ে দুর্বল গলায় বলল, তাহলে কি পরে আসব?

না, তোকে আর আসতেই হবে না।

সারা ক্লাস আবার উচ্চস্বরে হেসে ওঠে, দীপু লক্ষ করল বদরাগী স্যারটির চোখেও কেমন হাসি ফুটে উঠেছে। সাথে সাথে হঠাৎ করে দীপু বুঝতে পারল স্যার ওর সাথে মজা করছেন। যে স্যার প্রথম দিনেই কারো সাথে মজা করতে পারে সে আর যাই হোক বদরাগী হতে পারে না, দীপুর বুকে সাহস ফিরে আসে সাথে সাথে। সে একটু

হেসে বলল, কিন্তু স্যার, আমাকে আসতেই হবে।

আসতেই হবে? স্যার খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তাহলে আয়।

দীপু ভেতরে ঢুকল। স্যার কড়া চোখে ওর দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এবারে বল কেন তোকে আসতেই হবে?

আমি এই ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।

গুল মারছিস?

না স্যার, সত্যি ভর্তি হয়েছি।

সত্যি?

সত্যি।

ও! স্যার হতাশ হওয়ার ভান করে বললেন, তাহলে তো ওকে আসতে দিতেই হয়। কি বলিস তোরা?

পুরো ক্লাস মাথা নেড়ে সায় দিল আর হঠাৎ করে দীপুর পুরো ক্লাস আর এই বদরাগী চেহারার মজার স্যার সবাইকে ভাল লেগে গেল। মাঝে মাঝে ওর এরকম হয়, হঠাৎ হঠাৎ কাউকে ভাল লেগে যায়, কিন্তু পুরো ক্লাসকে একসাথে ভাল লেগে যাওয়া এই প্রথম।

এই স্কুলের নিয়ম-কানুন খুব কড়া, জানিস তো?

দীপু মাথা নেড়ে বলল, সে জানে যদিও ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না। স্যার মুখ গম্ভীর করে বললেন, নতুন কেউ আসার পর তাকে একটা লেকচার দিতে হয়।

দীপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

এইখানে, ক্লাসের সামনে। তোকেও দিতে হবে।

দীপু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আমি লেকচার দিতে পারি না স্যার, কোনদিন দেইনি।

সে আমি জানি না, তোকে দিতেই হবে। ঘড়ি ধরব পাঁচ মিনিট। স্যার হাত থেকে ঘড়ি খুলে চোখের সামনে ধরে বললেন, শুরু কর।

দীপুর মুখ শুকিয়ে গেল, শুকনো গলায় ঢোক গিলে আরেকবার স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যি স্যার, আমি এতজনের সামনে লেকচার দিতে পারব না। লেকচার দিতে হলে কি বলতে হয় আমি জানি না, স্যার।

দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। বল, তাড়াতাড়ি বল।

কি বলব, স্যার?

এই তুই কি করিস, কি করতে ভালবাসিস, কি খাস, কি পড়িস এইসব বলবি। নে, শুরু কর —

দীপু আরেকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, সত্যি বলছি স্যার, আমি পারব না।

ঠিক আছে, যদি না পারিস এখানে দাঁড়িয়ে থাক পাঁচ মিনিট আর তোরা সবাই চোখ বড় বড় করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাক।

বোঝাই যাচ্ছে ছেলেগুলো এই স্যারের খুব বাধ্য। আদেশ পাওয়া মাত্র সবাই চুপচাপ চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল, দীপু যেদিকে তাকায় দেখতে পায় একজোড়া চোখ ড্যাব ড্যাব করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পাঁচ মিনিট এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবে ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দুর্বল গলায় বলল, ঠিক আছে স্যার, আমি করছি। সে গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল, আঁ্যা আমার নাম মুহম্মদ আমিনুল আলম, আমি ক্লাস এইটে পড়ি।

ক্লাস এইটে পড়িস, সে তো সবাই জানে, না হয় এই ক্লাসে আসবি কেন? যেসব কেউ জানে না সেসব বল।

আমি এর আগে ক্লাস সেভেনে ছিলাম বগুড়া জিলা স্কুলে, ক্লাস সিক্সে ছিলাম চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে, ক্লাস ফাইভে থাকতে পড়তাম বান্দরবন হাই স্কুলে, ক্লাস ফোরে পচাগড় প্রাইমারী স্কুলে, ক্লাস থ্রীতে কিশোরীমোহন পাঠশালা সিলেটে, তার আগে ক্লাস টুতে ছিলাম আঁ্যা আঁ্যা— দীপু মাথা চুলকাতে থাকে মনে করার জন্যে। মনে করতে না পেরে বলল, রাঙ্গামাটিতে স্কুলটার নাম মনে নেই। ক্লাস ওয়ানে ছিলাম শেখঘাট জুনিয়র স্কুল —

সবাই হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। স্যারও একটু অবাক হয়ে বললেন, তুই কি বছর বছর স্কুল বদলাস নাকি?

আমার বদলাতে ভাল লাগে না, কিন্তু আমার আব্বা প্রত্যেক বছর নতুন জায়গায় যান তাই আমারও যেতে হয়।

হুঁ। স্যার আবার গম্ভীর হয়ে বললেন, লেকচার শেষ কর। মাত্র এক মিনিট হয়েছে।

মাত্র এক মিনিট! দীপুর গলা আবার শুকিয়ে যায়। করুণ মুখে সে স্যারের দিকে তাকাল, স্যার ওকে সাহস দিলেন, চমৎকার হচ্ছিল তো! শুরু কর আবার, কি করতে ভালবাসিস, কি পড়তে ভালবাসিস, কি খেলতে ভালবাসিস, এইসব বল।

দীপু আবার শুরু করল, আমি ডিটেকটিভ বই পড়তে খুব ভালবাসি। আমি অনেকগুলো ডিটেকটিভ বই পড়েছি তার মাঝে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে— দীপু হঠাৎ থেমে গেল কারণ ঠিক বুঝতে পারল না নামটা বলা উচিত হবে কিনা। একটু ভেবে বলেই ফেলল, প্রেতপুরীর অট্টহাসি? বইটা আমার কাছে আছে কেউ পড়তে চাইলে আমি তাকে দিতে পারি।

পড়েছি! আমি পড়েছি! ক্লাসের অর্ধেকের বেশি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল আর সাথে সাথে দীপু বুঝতে পারল ছেলেগুলোর সাথে বন্ধুত্ব হতে ওর দেরি হবে না।

এছাড়াও আমি অ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ি। যেমন : যখের ধন, আবার যখের ধন— তারপর টম সয়ার, হাক ফিনের দুঃসাহসিক অভিযান—

স্যার দীপুকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা কে কে মার্ক টোয়েনের টম সয়ার আর হাক ফিনের বই পড়েছিস?

মাত্র দুটি হাত উঠল। স্যার বললেন, খুব ভাল বই। সবার পড়া উচিত। আছে তোর কাছে বই দুটি?

আছে, স্যার।

তোর বন্ধুদের পড়তে দিস।

দেব, স্যার।

হুঁ, এবারে শেষ কর তোর লেকচার।

দীপু আবার শুরু করল, গল্পের বই ছাড়া আমার ফুটবল খেলতে ভাল লাগে। বগুড়া জিলা স্কুলে থাকতে ক্লাস এইটকে আমরা হারিয়ে দিয়েছিলাম।

মোটাসোটা একটা ছেলে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, কোন্ জায়গায় খেলো? সেন্টার ফরোয়ার্ড?

না, আমি রাইট আউট ছিলাম। সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলি মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে ব্যাকেও খেলি।

স্যার সাবধানে হাসি গোপন করলেন। তিনি খুব ভাল করে জানেন শুধুমাত্র নামেই সেন্টার ফরোয়ার্ড আর রাইট আউট। এই বয়েসী ছেলেদের খেলা শুরু হলে দেখা যায়, বল যেখানে গোল কীপার ছাড়া সবাই সেখানে দাপাদাপি করছে।

এছাড়া ব্যাডমিন্টনও খেলি কিন্তু ককের দাম এত বেশি হয়ে গেছে যে সব সময় খেলতে পারি না। কয় মিনিট হয়েছে, স্যার?

আড়াই মিনিট।

মাত্র আড়াই মিনিট?

হুঁ, শুরু কর আবার।

সব তো বলে ফেলেছি, আর কি বলব?

কি কি করতে পারিস এই সব বল।

কিছু করতে পারি না।

কিছু পারিস না? ছবি আঁকতে? গান গাইতে? সাইকেল চালাতে? সাঁতার কাটতে? মারামারি করতে?

দীপু মাথা নেড়ে বলল, আমি সীটে বসে সাইকেল চালাতে পারি, সাঁতারও দিতে পারি, ছবি আঁকতে পারি না, ড্রয়িং পরীক্ষায় আমি সবচেয়ে কম নাম্বার পাই। আর আমি গানও গাইতে পারি না।

মারামারি? সামনের বেঞ্চের একটা ছেলে ওকে মনে করিয়ে দিল।

ও, হ্যাঁ, আমি অল্প অল্প মারামারিও করতে পারি।

অল্প অল্প মারামারি আবার কি জিনিস? স্যার একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

দীপু মাথা চুলকে বলল, মানে ঠিক আসলে মারামারি না তবে কেউ যদি আমার সাথে মারামারি করতে চায় শুধু তাহলেই একটু ইয়ে— মানে অল্প অল্প, একটু একটু—

ও! ও! বুঝেছি, তুই নিজে থেকে করিস না, তবে কেউ করতে চাইলে না করিস না, এই তো?

সারা ক্লাস হেসে উঠল এবং দীপু নিজেও হেসে ফেলল।

এখনো দেড় মিনিট বাকি। নে, শুরু কর আবার।

দীপু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। আর কি সে করতে পারে মনে করার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। একগাল হেসে বলল, আমি বই বাঁধাই করতে পারি আর শর্ট সার্কিট হয়ে ফিউজ পুড়ে গেলে মেইন সুইচের ফিউজ বদলে ঠিক করে ফেলতে পারি।

কি বললি? শর্ট সার্কিট হয়ে—

হ্যাঁ, শর্ট সার্কিট হলে ফিউজ পুড়ে যায় তো, তখন মেইন সুইচ অফ করে স্ক্রুটা খুলে নিয়ে একটা চিকন তার ওখানে লাগিয়ে দিলে আবার সব ঠিক হয়ে যায়।

তুই ঠিক করিস ওভাবে?

হ্যাঁ, যখন দরকার হয়। খুব সহজ, আমার আব্বা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

স্যার চুপ করে রইলেন। ক্লাস এইটের ছেলেকে যে আব্বা মেইন সুইচ খোলা শিখিয়েছেন তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আর বই বাঁধাইয়ের কথা কি বললি?

হ্যাঁ, আমি বইও বাঁধাই করতে পারি। আমাদের বাসায় অনেক বই ছিঁড়ে গিয়েছিল তাই আমার আব্বা আমাকে বলেছিলেন, আমি যদি বই বাঁধাই করি তাহলে, দুটো বই বাঁধাই করার জন্যে একটাকা করে দেবেন। প্রথম প্রথম খুব বিচ্ছিরি হত. পরে আমি বুক বাইণ্ডিংয়ের দোকানে বসে থেকে দেখে দেখে শিখেছি। সেলাই করার পর শুধু প্রেস থেকে কাটিয়ে আনতে হয়, এখন আমি দোকানের মত করে করতে পারি।

ও! খুব ভাল। স্যার ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা আর কেউ বই বাঁধাই করতে পারিস?

একটি ছেলে হাত তুলল, ওর আব্বা বুক বাইণ্ডার, কাজেই সে তো পারবেই। স্যার বললেন, সবারই কিছু কিছু সত্যিকারের কাজ জানা উচিত। এখন তোরা ছোট আছিস, বড়রা তোদের কিছু করতে দেবে না কিন্তু সুযোগ পেলে শিখে নিবি। তারপর দীপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, নে তোর লেকচার শেষ, টাইম ওভার। ভালই বলেছিস। একটু থেমে বললেন, কয় ভাইবোন তোরা?

আমি একাই। আমাদের বাসায় শুধু আমি আর আমার আব্বা।

তোর আম্মা?

মুহূর্তের জন্যে দীপু থেমে গেল। ও জানে যেই সে বলবে তার আম্মা মারা গেছেন

অমনি সবাই কেমন করে জানি তার দিকে তাকাবে, ওর জন্যে সবার মায়া হবে। এটা ওর একটুও ভাল লাগে না। ওর আম্মার কথা ওর মনে নেই, কখনো দেখেওনি। আম্মার জন্যে ওর কখনো মন খারাপও হয়নি কিন্তু সবাই মনে করবে ও বুঝি খুব দুঃখী। দীপু একটু দ্বিধা করে বলল, আমার আম্মা মারা গেছেন।

ও! স্যার খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, আর দীপু যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। সারা ক্লাস হঠাৎ করে একেবারে চুপ করে গেল। কয়েক মুহূর্তে কোন শব্দ নেই, সমস্ত ক্লাস চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। দীপু একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমার আব্বা খুব ভাল, আমার আম্মা নেই বলে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

ও। স্যার একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কবে মারা গেছেন তোর আম্মা?

মনে নেই আমার, আমি কোনদিন দেখিনি।

হুম। স্যার খানিকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে বললেন, এবার তোর নামটা আবার বল দেখি খাতায় লিখে নিই।

দীপু তার নাম বলল, মুহম্মদ আমিনুল আলম।

তোর আব্বা কি তোকে মুহম্মদ আমিনুল আলম বলে ডাকেন?

না, দীপু বলে ডাকেন।

কি বললি? স্যার চোখ কুঁচকে তাকালেন।

দীপু।

অ্যাঁ? দীপু? আমাদের যে আরেকটা দীপু আছে, দুইটা দীপু হয়ে গেল যে, কি মুশকিল! কোথায় এক নাম্বার দীপু?

ক্লাসে কয়েকটা ছেলে মিলে একজনকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, এই যে, এই যে দীপু।

স্যার মুখ গম্ভীর করে বললেন, তাহলে কি করা যায়? দুজনের এক নাম হয়ে গেলে তো মুশকিল! একজনের অংক ভুল হয়ে গেলে আরেকজন পিটুনি খাবে যে!

স্যারের মুখ দেখে মনে হল সত্যিই বুঝি এটি একটি বড় সমস্যা। একজন হালকা পাতলা ছেলে হাত তুলে বলল, নাম্বার দিয়ে দেন দুজনের। একজন এক নাম্বার, একজন দুই নাম্বার।

সারা ক্লাস মাথা নেড়ে সায় দিল। কাজেই দীপুর আর কিছু বলার থাকল না। স্যার একটু হেসে বললেন, তাহলে তুই দীপু নাম্বার টু।

সেই থেকে দীপু আর দীপু রইল না, হয়ে গেল দীপু নাম্বার টু।

নতুন স্কুলে এসে এবারে দীপু খুব তাড়াতাড়ি সবার সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলল। সাধারণত এরকমটি হয় না কিন্তু ওদের এই ক্লাসটি সত্যিই ভাল। বোধহয় ক্লাস টিচারটি ভাল বলেই। শুধু একটি ছেলের সাথে তার গণ্ডগোল বেধে গেল প্রথম দিন

থেকেই। ছেলেটি বয়সে একটু বড়। স্বাস্থ্য খুব ভাল নয় কিন্তু বোঝা যায় গায়ে খুব জোর। নাম তারিক, ছেলেরা আড়ালে তারিক গুণ্ডা বলে ডাকে। সামনাসামনি ডেকে ফেললেও সে খুব একটা রাগ হয় না, বরং একটু খুশিই হয় বলে মনে হয়। প্রথম দিনই তারিক এসে দীপুর পেছনে চাটি মেরে জিজ্ঞেস করল, এই, তুই বই বাঁধাই করতে পারিস?

দীপু চটে উঠলেও ঠাণ্ডা গলায় বলল, খুব বেশি খাতির না হলে আমি কাউকে তুই করে বলি না। তোমার সাথে আমার এখনও খুব বেশি খাতির হয়নি।

তারিক হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলল, খাতির-ফাতির বুঝি না, আমি সবাইকে তুই করে বলি, তোকেও বলব।

ঠিক আছে বল, আমিও বলব।

কি বলবি?

আমিও তুই করে বলব।

আমাকে তুই করে বলবি?

একশবার।

দীপুর পাশে বসে থাকা ছেলেটি, বাবু নাম, দীপুকে একটা চিমটি কাটল। কিন্তু দীপু তেমন গা করল না। ও জানে, এখন সে যদি তারিককে জোর খাটাতে দেয় সে বরাবর জোর খাটিয়ে যাবে। তারিক খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু না বলে চলে গেল।

পাশে বসে থাকা বাবু ফিসফিস করে বলল, সর্বনাশ! তারিকের সাথে ঝগড়া করতে চাইছ?

কে বলল আমি ঝগড়া করতে চাইছি?

ও যা বলে শুনে যাও, এছাড়া বারো বারটা বাজিয়ে দেবে।

কি করবে? পেটাবে?

ওকে চেনো না তুমি, ও সব করতে পারে। একবার মিউনিসিপ্যাল স্কুলের খেলার পর ওদের হাফ ব্যাককে চাকু মেরেছিল, জান?

দীপু কিছু বলল না। সব স্কুলেই এরকম একটি দুটি ছেলে থাকে গায়ে বেশি জোর বলে নিরীহ ভাল ছেলেগুলোকে উৎপাত করে বেড়ায়। দীপু যদি একটু নরম হয়ে থাকে তাহলেই তারিক বেশি কিছু বলবে না, কিন্তু কেন দীপু নরম হয়ে থাকবে?

এর পরের কদিন তারিক ওকে এড়িয়ে গেল, দীপুও আর নিজে থেকে কিছু বলল না। আবার তারিকের সাথে ওর গণ্ডগোল লাগল ড্রিল ক্লাসে। প্রতি বুধবার বিকেলে ড্রিল ক্লাস, বরাবর সে দেখে এসেছে ড্রিল ক্লাস হয় সবচেয়ে মজার, লাফ ঝাঁপ হৈচৈ স্ফূর্তি, অথচ এখানে দেখল ড্রিল ক্লাসে যাবার আগে সবার চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। বাবুর কাছে শুনতে পেল ড্রিল স্যারটি নাকি আগে মিলিটারীতে ছিলেন আর ছেলেদের একেবারে মিলিটারীদের মত খাটিয়ে নেন, মারপিট করেন ইচ্ছেমত। মার খেতে কখনও

ভাল লাগে না কিন্তু ড্রিল ক্লাসে মারপিট করার সুযোগটা হয় কিভাবে সেটা দীপু বুঝতে পারল না। এখানে তো আর বাড়ির কাজ বা পড়া মুখস্থ করা নেই!

ব্যাপারটা বুঝতে পারল একটু পরেই। ড্রিল স্যার মাঠে রোদের মাঝে সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, এক দৌড়ে ঐ দেয়াল ছুঁয়ে ফিরে আসবি। আজকে শেষ দশজন।

দীপু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, শেষ দশজন মানে?

শেষ দশজন পিটুনি খাবে। অন্য দিন শেষ পাঁচজন খেত। তুমি দৌড়াতে পার তো?

দীপু মাথা নাড়ল।

হুঁ বাবা দৌড়াতে না পারলে বেতের বাড়ি খেতে হবে।

ড্রিল স্যার হুইসেল দিতেই সবাই প্রাণপণে ছুটতে লাগল। দেয়ালটি মাঠের আরেক মাথায়। ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে যেতে চায়। দীপু মোটামুটি প্রথম দিকেই ছিল কিন্তু হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পা বেঁধে পড়ে গেল। মাটিতে আছড়ে পড়ার আগের মুহূর্তে দেখল তারিক হলুদ দাঁত বের করে হাসতে হাসতে ওর ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। পেছন থেকে পা বাঁধিয়ে সেই দীপুকে ফেলে দিয়েছে।

দীপু বুঝতে পারছিল ও যদি উঠে আবার দৌড়াতে শুরু না করে তাহলে বেত খেতে হবে, কিন্তু এমন লেগেছে পায়ে যে ওঠার শক্তি নেই। চোখে পানি এসে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়। কোনমতে সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল তারপর পা টেনে টেনে দৌড়াতে লাগল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও পারল না, শেষ দশজনের ভেতর থেকে গেল।

প্রচণ্ড মারতে পারেন ড্রিল স্যার। দীপু বেশ শক্ত ছেলে তবু ওর চোখে পানি এসে গেল প্রায়। ওর নিজের থেকে বেশি খারাপ লাগল টিপু আর সাজ্জাদের জন্যে। টিপু ফার্স্ট বয়। খুব ভাল ছেলে কিন্তু জোরে দৌড়াতে পারে না, কাজেই প্রতি বুধবারে স্যার ওকে পিটিয়ে সুখ করে নেন। সাজ্জাদের কথা আলাদা; এত দুর্বল যে ওর দৌড়ানোর কোন প্রশ্নই আসে না, কিন্তু ড্রিল স্যার কিছুই শুনবেন না।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ড্রিল ক্লাসটি মনে হল পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা লম্বা। ক্লাসের শেষে সবাই একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। ছুটির ঘন্টা যখন পড়ল তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আছাড় খেয়ে দীপুর পায়ে বেশ লেগেছে, ছুটির পর ও যখন বাসায় ফিরে যাচ্ছিল তখনো সে অল্প অল্প খোঁড়াচ্ছে।

রাস্তার মোড়ে ওর তারিকের সাথে দেখা হল। হাতে একটা সিগারেট আড়াল করে ধরে রেখেছে। ওকে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, কিরে বুক বাইণ্ডার!

দীপু কথা না বলে হেঁটে যেতে লাগল। তারিক এদিক সেদিক তাকিয়ে সিগারেটে দুটি লম্বা টান দিয়ে সিগারেটটি ফেলে দিয়ে ওর পাশে পাশে হেঁটে যেতে থাকে। ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, কিরে আমার কয়টা বই বাইণ্ডিং করে দিবি?

দীপু অনেক কষ্ট করে সহ্য করে যাচ্ছিল। যদিও ভেতরে ভেতরে ও রাগে ফেটে

পড়তে চাইছিল তবুও ঠাণ্ডা গলায় বলল, দেব।

কত করে পয়সা নিবি?

পয়সা নেব না।

ফ্রি করে দিবি? কেন ফ্রি করে দিবি?

এমনি।

এমনি বুঝি কেউ বই বাইণ্ডিং করে দেয়? আমি কি তোর ইয়ে নাকি যে ফ্রি করে দিবি?

দীপুর মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে পড়ে শার্টের হাতা গুটিয়ে তারিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, শোন তারিক, তুই কি আমার সাথে ঝগড়া করতে চাস?

তারিক একটু থতমত খেয়ে বলল, কেন? ঝগড়া করতে চাই কে বলল?

তাহলে এরকম করছিস কেন? তুই দৌড়ের মাঠে আমাকে ল্যাং মেরে ফেলে মার খাইয়েছিস। এখন আবার আজেবাজে কথা বলে আমাকে ক্ষেপাতে চাইছিস? কেন? মারামারি করবি আমার সাথে?

খুব যে চোখ লাল করছিস আমার উপরে?

দ্যাখ তারিক, আমাকে টিপু, সাজ্জাদ বা বাবু পাসনি যে তুই যা ইচ্ছে বলবি আর আমি চুপ করে থাকব। যদি আমার সাথে মারামারি করতে চাস, আয়, আমি কাউকে ভয় পাই না। আর যদি না চাস সোজা তুই তোর বাসায় যা আমি আমার বাসায় যাই।

দীপু খুব যে একটা মারপিট করে অভ্যস্ত তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যেরকম জোর গলায় তারিককে সাবধান করে দিল যে তারিক আর ওকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, খুব ভঁট মারছিস? এমন ধোলাই দেব একদিন যে বাপের নাম ভুলে যাবি।

আজকেই দে না, এখনই দে না।

তারিক খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে হেঁটে পাশের গলিতে ঢুকে গেল।

বাসায় ফিরে যেতে যেতে দীপু বুঝল, ব্যাপারটা ওর জন্যে বেশি ভাল হল না কিন্তু ওর কিছু করার ছিল না।

দীপুর সাথে তার আব্বার সম্পর্ক একটু অদ্ভুত। মোটেই অন্য দশজন আব্বা আর তাদের ছেলের মত নয়। দীপু তার আব্বার সাথে এমনভাবে কথা বলে যেন তিনি তার ক্লাসেরই একটি ছেলে। নিজের আম্মাকে কখনো দেখেনি, আব্বাই তাকে বড় করেছেন একেবারে ছেলেবেলা থেকে। কাজেই দীপুর আব্বাই তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

বিছানায় পা বিছিয়ে বসে ছিলো দীপু, আব্বা ওর পায়ে ঝাঁঝালো গন্ধের কি একটা প্লাস্টার লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। আরামে দীপু আহ্। উহ্। করতে করতে আব্বাকে দিনের পুরো ঘটনা খুলে বলছিল। আব্বা চুপ করে শুনে যাচ্ছেন, ভাল মন্দ কিছুই বলছেন না। দীপু আশা করছিল আব্বা তার পক্ষ নিয়ে বলবেন তারিক যে কাজটা করেছে সেটা

অন্যায়। কিন্তু আব্বা একবারও তারিককে দোষ দিয়ে একটা কথাও বললেন না। দীপু বিরক্ত হয়ে বললো, তুমি কি মনে করছো সব দোষ তাহলে আমার?

কে বলল সব দোষ তোর?

তাহলে —

তাহলে কি?

তারিক যে আমাকে ধোলাই দেবে বলল?

তা আমি কি করব?

দীপু চুপ করে থাকল, সত্যিই তো ওর আব্বা কি করবেন? কিন্তু সমবেদনাটা তো ও পেতে পারে।

তাহলে তুমি বলছ মারামারি করি ওর সাথে?

আমি কিছু বলছি না।

ও যদি করতে চায়?

ইচ্ছে হলে করবি, ইচ্ছে না হলে করবি না, মার খাবি।

দীপু হাল ছেড়ে দিল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি ওর সাথে গণ্ডগোল করতে চাই না, অথচ এমন পাজি ইচ্ছে করে ঝগড়া করে। জান আব্বা, এখনি সিগারেট খাওয়া শুরু করেছে।

তুই কি মনে করিস সিগারেট খেলেই মানুষ পাজি হয়?

হয়ই তো।

তাহলে আমিও পাজি?

যাও! দীপু হেসে বলল, তুমি কত বড় আর ও কত ছোট!

আমিও তো অনেক ছোট থেকে সিগারেট খেতাম।

দীপু খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ওর আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সত্যি যদি ওর আব্বাও অনেক ছোট থেকে সিগারেট খাওয়া শুরু করে থাকেন তাহলে অবিশ্যি সিগারেট খাওয়ার অপরাধে তারিককে পাজি বলা যায় না। ওর আব্বার মত ভাল মানুষ পৃথিবীতে কয়জন আছে?

তবুও ছোটবেলায় সিগারেট খাওয়া শুরু করাটা সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। পাল্টা প্রশ্ন করল, তাহলে তুমি মনে কর ছোট থাকতে সিগারেট খেলে কোন দোষ নেই? আমি সিগারেট খাওয়া শুরু করলে তুমি খুশি হবে?

তুই খাবি কেন?

যদি খাই।

তাহলে বুঝব তুই খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতে শুরু করেছিস, সিগারেট খাওয়া শিখেছিস।

দীপু চোখ বড় বড় করে বলল, তাই তো বলছি তারিক সিগারেট খায়, এর মানে খারাপ ছেলেদের সাথে মেশে।

একশবার। তাই বলে ও নিজেও খারাপ ছেলে তুই কেমন করে জানিস। হয়তো আবার ভাল ছেলেদের সাথে মিশে ভাল হয়ে যাবে। আর ও যে তোকে দেখানোর জন্যে সিগারেট খায়নি সেটা কে বলবে? ঐ রকম বয়সে সবার ইচ্ছে হয় একটা কিছু দেখাতে।

দীপু আবার হাল ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে বলল, বেশ তারিকের কোন দোষ নেই, ও একটা বাচ্চা মহাপুরুষ।

আব্বা হেসে ফেললেন। বললেন, শোন, তোকে একটা কথা বলে রাখি।

কি?

তুই তারিককে দেখতে পারিস না, ঠিক?

দীপু একটু দ্বিধা করে মাথা নাড়ল।

তাই তারিকও তোকে দেখতে পারে না। যদি কখনো এরকম হয় যে তোর হঠাৎ তারিককে ভাল লেগে যায় তাহলে দেখবি তারিকও তোকে বন্ধু মনে করবে।

দীপু মাথা নেড়ে বলল, তারিককে ভাল লাগা অসম্ভব। চেহারা দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। হলুদ দাঁত, কয়দিন যে দাঁত মাজে না কে জানে।

আব্বা বললেন, তারিককে দেখতে পারিস না বলে খালি তার দোষগুলো চোখে পড়ছে। খোঁজ নিয়ে দেখ তারিকও তার বন্ধুদের বলছে দীপুর চেহারা দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, খরগোসের মত কান।

দীপু হেসে ফেলল। সত্যিই ওর কান ওর মুখের তুলনায় একটু বড়, কিন্তু এটা কি ওর দোষ?

দিনগুলো চমৎকার কাটছিল দীপুর. অনেক বন্ধু হয়ে গেছে ওর ; ক্লাসের সবার সাথেই ওর পরিচয়। প্রায় সবার বাসাতেই যায়, বন্ধুদের আম্মাদের এমন ঘনিষ্ঠভাবে খালাম্মা বলে ডাকে যে মনে হবে বুঝি কতদিনের পরিচয়। ওর নিজের বই পড়ার শখ। কাজেই যাদের বাসায় বই আছে হেঁটে হেঁটে সেখান থেকে বই নিয়ে আসতে ওর কোন ক্লান্তি নেই।

তারিক যদিও ধোলাই দেবে বলে শাসিয়েছিল কিন্তু সেরকম কোন চেষ্টা করল না। অবিশ্যি ওর সাথে আর খাতিরও হল না। দুজন দুজনকে এড়িয়ে যায়। মাঝেমধ্যে মেজাজ খারাপ থাকলে তারিক অবিশ্যি ঝগড়া খুঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করে, দীপু তেমন সুযোগ দেয় না।

স্কুলেও চমৎকার সময় কাটছিল শুধু বুধবার করে ড্রিল স্যারের ক্লাসটা আস্তে আস্তে অসহ্য হয়ে উঠল। প্রথম বারের পরে ও আর তেমন বেশি কিছু মার খায়নি কিন্তু ভাল ভাল দুর্বল ছেলেগুলোকে মুখ বুজে মার খেতে দেখে দেখে ওর বিরক্তি ধরে গেছে। একদিন টাইফয়েড থেকে উঠে এসে কমল মার খেয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। দেখে দীপুর এমন খারাপ লাগল যে বলার নয়। এই অর্থহীন মারপিট কিভাবে বন্ধ করা যায় সেটা নিয়ে সেদিন থেকেই সে সবার সাথে কথা বলতে শুরু করল। প্রথমে ঘনিষ্ঠ

কয়েকজন তারপর ক্লাসের প্রায় সবাইকে নিয়েই সে ছোটখাট কয়েকটা মিটিং করল। তারিকের মত দু একজন ছাড়া সবাই দীপুর সাথে একমত হয়ে বলল সত্যি এটা বন্ধ করা দরকার। দৌড়ে যারা শেষে এসে পৌঁছবে তাদের পিটিয়ে যাওয়া রীতিমত অন্যায়। দৌড়াতে না পারাটা কারো অপরাধ হতে পারে না।

অনেক আলোচনা করেও ঠিক করা গেল না কিভাবে এটা বন্ধ করা যায়। বেশির ভাগ ছেলেই বলল সবাই মিলে হেডস্যারের কাছে নালিশ করা হোক। অবিশ্যি কেউই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারল না হেডস্যারকে বললে ড্রিল স্যারের উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে না দ্বিগুণ বেড়ে যাবে।

নালিশ করার বুদ্ধিটা দীপু প্রথমেই বাতিল করে দিল। সোজা বলে দিল নালিশ করার মাঝে সে নেই। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় একবার একটা ছেলের কাছে মার খেয়ে সে স্যারকে নালিশ করে উল্টো নিজে মার খেয়েছিল। দীপু এখনও কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। হয়ত ঐ ছেলেটা শহরের ডেপুটি কমিশনারের ছেলে বলে স্যার তাকে শাস্তি দিতে সাহস পাননি। কিন্তু উল্টো সে নিজে কেন মার খেল এখনো চিন্তা করে পায় না। বাসায় এসে সে তার আব্বাকে ঘটনাটা খুলে বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল, আব্বা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে, তবু শোন বাবা, এরকম ব্যাপার অনেকবার ঘটবে। যত বড় হবি তত বেশি দেখবি। কাজেই কখনো কাউকে কিছু নিয়ে নালিশ করবি না। যাদের নিজেদের কিছু করার ক্ষমতা নেই শুধু তারা নালিশ করে।

দীপু কথাটা মনে রেখেছে। এর পরে সে কখনো কাউকে কিছু নিয়ে নালিশ করেনি। এবারেও হেডস্যারের কাছে নালিশ করার বুদ্ধিটা সে সোজাসুজি বাতিল করে দিল। কিন্তু তার বদলে কি করা হবে সেটা বলে দেয়া এত সহজ হল না।

সবাই হাল ছেড়েই দিয়েছিল, ঠিক তক্ষুণি দীপুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ক্লাসের সবাই সম্ভব না হলে বেশির ভাগ ছেলেদের রাজি করাতে পারলেই সে তার বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে পারে। প্রথমে একজন দুজন, তারপরে বেশ কয়েকজন, শেষে প্রায় সবাই রাজি হয়ে গেল। পরের বুধবারের জন্যে তখন দীপু অপেক্ষা করতে লাগল খুব আগ্রহ নিয়ে।

বুধবারের ড্রিল ক্লাসে ড্রিল স্যার সেদিনও সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে বলে দিয়েছেন, আজ শেষ পাঁচজন। স্যার যদি একটু লক্ষ্য করতেন তাহলে দেখতেন ছেলেদের ভেতর আজ আর ভয়ের ভাবটা নেই বরং একটু উত্তেজনা। সবার চোখ চকচক করছে।

স্যার বাঁশিতে ফুঁ দিলেন, অন্য দিনের মত সবার প্রাণপণে ছুটে যাবার বদলে আজ একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। সবাই মিলে এক লাইনে আস্তে আস্তে দৌড়াতে লাগল। প্রথমে একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কিছুক্ষণেই সবাই লাইন ঠিক করে ফেলল। তারিক এবং আরো দুএকজন শুধু প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছিল, দীপু জানত ওরা

করে। কিন্তু যখন দেখল অন্যরা সবাই সত্যি এক লাইনে ছুটে যাচ্ছে তখন আর একা দৌড়াতে ভরসা পেল না, তারিক এবং আর বাকি তিনজনও ফিরে এসে লাইনে মিশে গেল। তখন দীপুর স্ফূর্তির সীমা থাকল না।

ড্রিল স্যারের বিস্ফারিত চোখের সামনে চল্লিশজন এক লাইনে তালে তালে পা ফেলে দেয়াল ছুঁয়ে আবার তালে তালে পা ফেলে ফিরে আসতে লাগল। এমন শৃঙ্খলা কখনো দেখা যায় না, রাস্তায় লোকজন দাঁড়িয়ে গেল মজা দেখতে। দৌড় শেষ হবার সময় সবাই দুপাশে তাকিয়ে লাইন ঠিক করে নিল আর দীপু যেরকম চেয়েছিল ঠিক সেরকম করে একসাথে লাইনে পা দিয়ে কয়েক পা ছুটে থেমে গেল।

আজ আর কেউ এগিয়ে যায়নি কেউ পিছিয়েও পড়েনি, এবারে দেখা যাবে শেষ পাঁচজন কিভাবে বেছে নেন।

স্যার লম্বা লাইনটির দিকে তাকালেন, রাগে তার মুখ থমথম করছে। হাতের বেতটি মুচড়িয়ে এগিয়ে এসে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, এটা কার বুদ্ধি?

কেউ কোন কথা বলল না।

কার বুদ্ধি এটা? প্রচণ্ড ধমকে অনেকে কেঁপে উঠল-এবার তবুও কেউ কোন কথা বলল না। স্যারের মুখ অপমানে কাল হয়ে উঠল। দাঁত চিবিয়ে বললেন, যদি না বলিস তাহলে একপাশ থেকে মারতে শুরু করবো। এমন মার মারবো যা কোনদিন দেখিসনি। এক মিনিট সময় দিলাম —

ভয়ের একটা কাঁপুনি দীপুর মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল। ও বুঝতে পারল এক মিনিট পর সত্যি স্যার একপাশ থেকে মারতে শুরু করবেন। দীপু ভেবেছিল ক্লাসের সব ছেলেকে কোনদিন মারা সম্ভব না, তাই কাউকে মারবেন না। কিন্তু এখন দেখল এই স্যারের জন্যে সবকিছুই সম্ভব।

এক মিনিট পর আমি মারতে শুরু করব, এখনো বল কার মাথা থেকে এটি বেরিয়েছে? কে এই বুদ্ধি বের করেছিস এক পা এগিয়ে আয়।

কেউ কোন কথা বলল না। কয়েকজন আড়চোখে দীপুকে দেখার চেষ্টা করল।

দীপু ঠিক করল ও স্বীকার করে নেবে বুদ্ধিটা ওর। তার একার জন্যে সবাইকে মার খাওয়ানো ঠিক হবে না। খামোকা পাঁচজনের মার খাওয়া বন্ধ করতে গিয়ে সবাইকে মার খাওয়ানো শুরু করিয়ে লাভ কি? দীপু শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে অল্প অল্প কাঁপতে লাগল।

এগিয়ে আয় এক পা, স্যার আবার চিৎকার করে উঠলেন।

দীপু এক পা এগিয়ে গেল, ওর মুখ ফ্যাকাসে, পা কাঁপছে থর থর করে। সহ্য করতে পারবে তো মার? কেঁদে ফেলবে না তো যন্ত্রণায়?

লাইনে বাকি ছেলেগুলো মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ টিপু ছটফট করে উঠল। তারপর এক পা এগিয়ে এসে দীপুর পাশে দাঁড়াল। টিপুর দেখাদেখি কমল আর সাজ্জাদও এগিয়ে আসে সামনে। আর তাদের দেখাদেখি হঠাৎ পুরো ক্লাস এক পা

এগিয়ে এসে দীপুর দুপাশে সারি বেঁধে দাঁড়াল। তারিক একা একা শুধু আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সেও সাবধানে এগিয়ে এসে লম্বা লাইনে মিশে গেল।

দীপু দুপাশে তাকাল, তার কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দুপাশে চল্লিশজন ছেলের লম্বা সারি, সবাই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোন কথা বলছে না। কিন্তু দীপু বুঝতে পারছে ওরা কেউ ওকে একা মার খেতে দেবে না। ওর বুকের ভেতর জানি কেমন করে ওঠে, চোখে পানি এসে ঝাপসা হয়ে যায় সবকিছু।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার স্যার কাউকেই মারলেন না। অনেকক্ষণ ওদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন তারপর বেতটা ছুঁড়ে ফেলে পুরো ক্লাসটা ছুটি দিয়ে দিলেন। ওরা ফিরে যেতে যেতে দেখল স্যার একা মাঠের মাঝে চুপচাপ বসে বসে সিগারেট খাচ্ছেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। মনে হচ্ছে অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন হঠাৎ করে।

এর পরেও স্যার মাস তিনেক ছিলেন স্কুলে, তারপর রিটায়ার্ড করে চলে গেলেন। এর মাঝে একবারও নাকি একটি ছেলেকেও মারেননি।

ক্লাস নাইনের সাথে ফুটবল খেলায় কে ক্যাপ্টেন হবে সেটা নিয়ে ক্লাসের পর আলোচনা হচ্ছিল। তারিকের লজ্জা শরম বরাবরই কম। সে সোজাসুজি ক্যাপ্টেন হতে চাইল। দীপু আপত্তি করে বলল, যে সবচেয়ে ভাল খেলে রফিক, সে হবে ক্যাপ্টেন। রফিক ভয়ে ভয়ে বলল, তার ক্যাপ্টেন হবার ইচ্ছে নেই, তারিকই হোক।

দীপুর খুব খারাপ লাগছিল, সবগুলো ছেলে তারিককে ভয় পায়, তাই ন্যায় হোক অন্যায় হোক তারিক যেটা চায় সেটাই সবার মেনে নিতে হয়। রফিকের ক্যাপ্টেন হবার খাঁটি অধিকার আছে। ওর মত ভাল ফুটবল সারা স্কুলে কেউ খেলতে পারে কিনা সন্দেহ আছে। শুধু যে ভাল খেলে তাই নয় ওর মত ভাল খেলা কেউ বুঝতে পারে না। খেলার মাঝখানে ঠিক কাকে কোনখানে বদলে দিয়ে কি করতে দিলে খেলা ম্যাজিকের মত পাল্টে যায় সেটা শুধু রফিকই বলতে পারে। অথচ তারিক জোর জবরদস্তি করে ক্যাপ্টেন হতে চাইছে, যেন ক্যাপ্টেন হওয়াটাই সব।

দীপু পরিষ্কার করে বলে দিল, রফিক ক্যাপ্টেন না হলে খেলা হবে না। ড্রিল ক্লাসের ঘটনার পর অনেকেই তারিকের থেকে দীপুর কথাকে বেশি গুরুত্ব দেয়, কাজেই সত্যি সত্যি রফিককে ক্যাপ্টেন করে টিম করে ফেলা হল। টিমে তারিকও থাকল, শুধু যাবার সময় দাঁতে দাঁত ঘষে দীপুকে বলে গেল সে ওকে দেখে নেবে এক হাত। এর আগেও তারিক অনেকবার দীপুকে দেখে নিতে চেয়েছে। কাজেই সে খুব একটা গা করল না।

ক্লাস নাইনের সাথে খেলার জন্যে ওদের খুব জোর প্র্যাকটিস শুরু করতে হল। প্রতিদিন বিকেলে ওরা অনেকক্ষণ মাঠে খেলে। বাসায় যেতে যেতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়ে যায়, আর ভাত খাবার পর কিছুতেই জেগে থাকতে পারে না। আব্বা পড়ার টেবিল থেকে মাঝে মাঝে কোলে করে ওকে বিছানায় এনে শুইয়ে দেন। সকালে ঘুম থেকে

উঠে ওর লজ্জার সীমা থাকে না।

সেদিন সন্ধ্যার ঠিক আগে দীপু ফুটবল খেলে ফিরে আসছিল। পুরানো জমিদার বাড়িটার কাছে ফাঁকা জায়গাটায় হঠাৎ সে তারিক আর তার দুজন বন্ধুকে আবিষ্কার করল। প্রায় অন্ধকারে ওরকম একটা জায়গায় ওরকম তিনটা ছেলেকে দেখেই দীপুর মনে হল ওরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ভয়ে ওর বুক ধ্বক ধ্বক করে উঠলেও সে গলায় জোর এনে জিজ্ঞেস করল, কিরে তারিক কি করছিস ওখানে?

তারিক উত্তর না দিয়ে বলল, এদিকে শোন।

দীপু এগিয়ে গেল। কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই তারিক হঠাৎ করে তার মুখে এক ঘুসি মেরে বসল। কিছু বলার আগে পাশের দুজন তাকে জাপটে ধরে ফেলল।

দীপু মুখে নোনতা রক্তের স্বাদ পেল, ঠোঁট কেটে গেছে বোধ হয়। আবছা অন্ধকারে তারিকের মুখ ঠিক দেখা যাচ্ছিল না আবার মারবে কিনা তাও বুঝতে পারছিল না। মার খেলেই পাল্টা মার দিয়ে এসেছে দীপু কিন্তু এখন ওকে দুজন যেভাবে ধরে রেখেছে যে ওর নড়ার শক্তি নেই। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। নিজেকে বাঁচাতে হলে এখন ওর উল্টো দিকে দৌড়ানো উচিত। কিন্তু ওর দৌড়াতে লজ্জা হল। তারিকের দিকে তাকিয়ে বলল, লজ্জা করে না তিনজন মিলে একজনকে মারছিস?

ধর হারামজাদাকে!

আবার তিনজন মিলে ওকে জাপটে ধরল। কয়টা ঘুসি যে সে খেল তার আর কোন হিসেব নেই। প্রাণপণে সে মারামারি করে গেল কিন্তু তিনজন শক্ত ছেলের সাথে তার একার পেরে ওঠা অসম্ভব। অল্পক্ষণের মাঝে দুজন তাকে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। দুই হাত পেছন দিকে নিয়ে তাকে এমনভাবে ধরেছিল যে সে নড়তে পারছিল না।

তুলে দাঁড় করা শুয়োরকে।

তারিকের কথামত অন্য দুজন অনুগত ভৃত্যের মত তাকে তুলে দাঁড় করাল। দীপুর চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছিল কিন্তু অনেক কষ্টে সে পানি আটকে রাখল।

আমার সাথে আর লাগতে আসবি?

আমি কারো সাথে লাগতে যাই না।

আবার মুখে মুখে কথা? তারিক এগিয়ে এসে পেটে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল। মুহূর্তের জন্যে দীপু চোখে অন্ধকার দেখে, ওর দম বন্ধ হয়ে আসে যন্ত্রণায়। মিনিটখানেক সময় লাগল ওর ঠিক হতে। মুখ হাঁ করে ও বড় বড় করে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিল।

বল, আমার সাথে লাগতে আসবি?

আমি কারো সাথে লাগতে যাই না। তুই আমার সাথে লাগতে আসিস।

আবার একটা ঘুসি, এবার চোয়ালে। কট্ করে কোথা যেন একটা শব্দ হল, মিনিট দুয়েক সে কিছু শুনতে পায় না।

বল হারামজাদা আমার সাথে আর লাগতে আসবি কিনা!

দীপুর কেমন যেন একটা রোখ চেপে গেল। ও ক্ষ্যাপার মত বলল, আমি লাগতে আসি না, তুই লাগতে আসিস— তুই-তুই—

আবার ঘুসি খেল একটা। তারিক ওর বুকের কলার চেপে ধরে বলল, বল— না। এছাড়া মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।

বলব না।

বল, আর কখনো করব না, ছেড়ে দেব তাহলে।

দীপু চিৎকার করে বলল, বলব না।

দাঁড়া হারামজাদা, দেখাচ্ছি মজা।

তারিক পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে নিয়ে দীপুর ডান হাতের দুই আঙুলের মাঝখানে রেখে দুপাশ থেকে চাপ দিতে থাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দীপু চিৎকার করে উঠল, মনে হল ওর আঙুল দুটি বুঝি ভেঙে যাবে।

বল হারামজাদা আর কখনও করবি কিনা, বল।

দীপু তবু বলল, না, প্রাণপণে ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে হুটোপুটি করতে করতে একসময়ে তিনজনেই মাটিতে পড়ে গেল। জাপটাজাপটি করতে লাগল মাটিতে পড়ে, তার মাঝে তারিক দুই আঙুলের মাঝখানে পেন্সিল রেখে চাপ দিতে লাগল আর বলতে লাগল, বল আর করব না, বল তাহলে ছেড়ে দেব।

মরে গেলেও বলব না— মরে গেলেও বলব না — দীপু ঠোঁট কামড়ে যন্ত্রণা সহ্য করতে চেষ্টা করে, মুখে বিন্দুবিন্দু ঘাম জমে ওঠে ওর, বুঝতে পারে আর একটু জোরে হলেই ওর আঙুল ভেঙে যাবে মট্ করে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় ওর। মুখ শুকিয়ে যায় কাগজের মত, তবুও পাগলের মত নিজেকে বলতে থাকে, বলব না, বলব না, বলব না।

হঠাৎ করে তারিক ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, কে জানি আসছে।

সত্যি?

হুঁ। ওকে ঠেলে দাঁড় করায় ওরা, তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে সত্যি কেউ আসছে কিনা। দেখা গেল সত্যিই কে একজন হেঁটে হেঁটে আসছে এদিকে।

পালা—

দীপুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ওরা দেয়াল টপকে পালিয়ে যায়। দুর্বল দীপু ধাক্কা সামলাতে পারে না হুমড়ি খেয়ে গিয়ে দেয়ালের ওপর পড়ে। হাত দিয়ে দুর্বলভাবে আটকাতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, প্রচণ্ডভাবে ওর মাথা ঠুকে যায় দেয়ালের সাথে। মনে হল ওর ও মরে যাবে এখনিই। হঠাৎ করে ওর ভীষণ কান্না পেল, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসে ঝরঝর করে। লোকটি এগিয়ে এসে দীপুকে দেখে থেমে যায়, কে? কে ওখানে?

গলার স্বরে চিনতে পারে দীপু, ওদের স্যার, ক্লাস টিচার।

দীপু ওঠার চেষ্টা করছিল, স্যার টেনে তুললেন ওকে। কে? দীপু? তুই?

দীপু মাথা নাড়ল।

কি হয়েছে? কি করছিস?

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তবু বোঝা যায় মারামারি না করলে এরকম অবস্থা হয় না।

কার সাথে মারামারি করছিলি?

হঠাৎ স্যারের মনে হল দীপুর কানটা ভেজা, চিটচিটে। ম্যাচ জ্বেলে দেখলেন রক্ত। একি! মাথা ফেটে গেছে নাকি?

দীপু মাথা নাড়ল। ওরও তাই মনে হচ্ছিল। মাথার পেছন দিকটা দেয়ালে ঠুকে ফেটে গেছে। স্যার ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন রাস্তায়, তারপর রিক্সা করে তার পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে। মাথা ব্যাণ্ডেজ করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন নিজে। কিন্তু হাজার ধমক দিয়েও বের করতে পারলেন না কে তার এই অবস্থা করেছে। কখনো কিছু নিয়ে নালিশ করবে না প্রতিজ্ঞাটা ভেঙে ফেলতে চাইছিল না যদিও ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল পুরো ঘটনাটা স্যারকে বলে তারিকের ওপর মনের ঝালটা মেটাতে।

রাতে বাসায় খেতে বসে আব্বা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, কি, তারিক তাহলে ধোলাই দিল শেষ পর্যন্ত!

দীপু কাঁদবে না ভেবেও হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আব্বা এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, একি কাঁদছিস কেন? ছিঃ, পুরুষ মানুষের কাঁদতে নেই। মার খেয়ে কেউ কাঁদে নাকি বোকা ছেলে!

পরদিন দীপু স্কুলে যেতে পারল না। রাতে প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। বিকেলে ওর বন্ধুরা দেখা করতে আসে। যদিও দীপু কাউকে বলেনি তবুও ওরা বুঝে গিয়েছিল তারিকই দীপুর এ অবস্থা করেছে। দীপুর বিছানা ঘিরে সবাই বসে রইল, আর বালিশে হেলান দিয়ে বসে দীপু পুরো ঘটনাটা শোনালো। সব শুনে নান্টু জিজ্ঞেস করল, স্কুলে যাবি কবে?

কাল যেতে পারি। তারিক এসেছিল আজ স্কুলে?

না, আমি দেখেছি বিকেলে বাসের ক্যান্টিনে বসে চা খাচ্ছে।

তোকে কিছু বলল?

আমাকে জিজ্ঞেস করল, স্যার ওর খোঁজ করেছেন কি না।

তুই কি বললি?

আমি বললাম, না। শুনে খুব অবাক হল। তুই স্যারকে কিছু বলিসনি?

উঁহু।

কেন, বললি না কেন? সাজ্জাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

এমনি।

বাবু বলল, স্যার এমনিতে কাউকে মারেন না কিন্তু যদি কখনো সত্যিকারের ক্ষেপে যান হুঁ হুঁ বাবা ছাল তুলে দেন মেরে। মনে আছে একবার কিবরিয়াকে কি মারটা দিলেন!

ওহ! নান্টু মাথা নাড়ল, তুই যদি কালকে স্যারকে বলে দিতি তাহলে দেখতি মজা।

দীপু কথা বলল না। আহাদ জিজ্ঞেস করল, স্কুলে যাবি তো কাল? গিয়েই স্যারকে বলিস।

উহুঁ।

কেন?

আমি কাউকে নালিশ করব না। কখনো করি না। যদি পারি নিজে পেটাব তারিককে, এমন টাইট করে দেব—

তুই পেটাবি তারিককে? সবাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল দীপুর দিকে. দীপু মুখ শক্ত করে বসে রইল। ওরা বিশ্বাস না করতে চায় তো না করুক, কিন্তু সে এর শোধ নেবে না?

ক্লাস নাইনের সাথে ফুটবল খেলায় দীপু খেলতে পারল না। খেলার দিনে মাঠের পাশে বসে সে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গেল অন্যদের সাথে। যদিও তাতে কোন লাভ হল না, ওরা হেরে গেল। তারিক খুব খেটে খেলছিল, দু বার সে গোল বাঁচাবার জন্যে এমন ঝুঁকি নিয়েছিল যে আরেকটু হলে পা ভেঙে যেতে পারত। দীপু খেলতে পারলে হয়ত খেলা আরেকটু ভাল হত, কিন্তু ওরা হেরে যেত ঠিকই, ক্লাস নাইনের সবাই খুব ভাল খেলে।

খেলা দেখে বাসায় ফিরে আসার সময় রাস্তার মোড়ে তারিককে দেখতে পেল দীপু। কাদামাখা কাপড় জামা পরে বাসায় যাচ্ছিল। দীপুকে দেখে একটু অপরাধীর মত হাসল তারিক। দীপু না দেখার ভান করে এগিয়ে যেতে লাগল. খেলার পর তারিকের ওপর থেকে রাগ অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু মার খাওয়ার ঘটনাটা এখনো ভোলেনি, মাথায় তখনো তার ব্যাণ্ডেজ!

তারিক একটু এগিয়ে এসে দীপুর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। আস্তে আস্তে বলল, এই দীপু!

উঁ।

ইয়ে, মানে, শোন—

কি?

আমি কিন্তু তোর মাথা ফাটাতে চাইনি। কিভাবে যে—

ভ্যাদর ভ্যাদর করিস না। বাড়ি যা তুই।

ক্ষেপেছিস আমার ওপর না? অবিশ্যি ক্ষ্যাপারই কথা। একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, মেজাজটা কেন যে এত খারাপ হল সেদিন। আর তুইও এরকম— হঠাৎ সুর পাল্টে তারিক জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তুই স্যারকে আমার নাম বললি না কেন? আমি যা ভয়

পেয়েছিলাম।

দীপু কথা না বলে হেঁটে যেতে লাগল। তারিক একটু বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করল, অ্যাঁ? নালিশ করলি না কেন?

তোকে যদি কুত্তায় কামড়ায় তুই কাউকে নালিশ করিস?

অপমানে তারিকের মুখ কালো হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, তার মানে আমি কুত্তা?

একশবার। মানুষ হলে কখনও তিনজন মিলে একজনকে পেটায়? শুনেছিস কখনো? ব্যাটাছেলেরা তিনজন মিলে একজনকে পিটিয়েছে? থুঃ। দীপু ঘেন্নায় থুতু ফেলল একবার।

তারিকের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল লজ্জায়। দীপু খেয়াল না করে বলে যেতে লাগল, নালিশ করিনি দেখে ভাবিস না আমি ভয় পেয়েছি বা ভুলে গেছি। একটু ভাল হয়ে নিই তারপর তোকে আমি পেটাব, খোদার কসম।

আমাকে পেটাবি?

হ্যাঁ, খোদার কসম; ব্যাটা ছেলে হলে একলা আসিস। আমি বন্ধুদের নিয়ে আসব না।

দীপু গটগট করে বাসায় হেঁটে গেল আর তারিক একা একা রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে লাগল। ওর এমন মন খারাপ হল যে তা আর বলার নয়। দীপু ওকে পেটাবে এটা সে বিশ্বাস করে না কিন্তু তিনজন মিলে একা দীপুকে পিটিয়েছে বলে দীপু ওকে যে ঘেন্না করে সেটা তো অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ও বুঝতে পারে অনেকেই তাকে ঘেন্না করে কিন্তু দীপু প্রথম তার মুখের উপর বলে দিয়ে গেল। আর সত্যিই তো, দীপু তো ওকে ঘেন্না করতেই পারে।

খানিকক্ষণ পর তারিকের নিজের উপর নিজের ঘেন্না হতে লাগল।

বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে। দীপু এখনও তারিককে পেটায়নি, পেটাবে সেরকম সম্ভাবনা কম। রাগটা প্রথম দিকে যেরকম বেশি ছিল এখন আর সেরকম নেই। তাছাড়া কোনরকম ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আগে মার খেয়েছিল বলে একদিন পাল্টা মার দেয়া বেশ কঠিন। মানুষ ক্ষেপে না উঠলে মারামারি করবে কেমন করে? তাছাড়া তারিক আজকাল অনেক ভাল হয়ে গেছে, অন্তত দীপুর সাথে। আগে সবসময় যেরকম একটা ঝগড়া খুঁচিয়ে তুলতে চাইত এখন আর তা করে না, কাজেই দীপু আর মারামারি করার উৎসাহ পায় না।

এমনিতে সময় মোটামুটি খারাপ কাটছিল না। বিকেলে ফুটবল খেলে সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে আসে। সামনে হাফ ইয়ারলী পরীক্ষা, তাই আজকাল একটু পড়াশোনার চাপ। পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেলে সবাই বাঁচে।

সেদিন খেলা শেষ করে সবাই দল বেঁধে ফিরে আসছিল। পানির ট্যাংকটার কাছে

এসে কে যেন বলল তার বড় ভাই স্কুলে পড়ার সময় একবার ওটার উপরে উঠেছিল।

তারিক ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে বলল, কি আমার বীর! আমি এইটার ওপর কতবার উঠেছি।

গুল মারিস না।

তারিক ক্ষেপে উঠল, সত্যি সত্যি সে কয়েকবার এটার উপরে উঠেছে। চেঁচিয়ে বলল, যদি এখন উঠে তোদের দেখাই?

দেখা না!

যদি উঠি কি দিবি?

দরকার নেই বাবা, আছাড় খেয়ে পড়বি পরে আমার দোষ হবে।

তারিক ক্ষেপে উঠল, কি বললি? আছাড় খাব? তাহলে দ্যাখ আমি উঠছি।

দীপু বাধা দিয়ে বলল, সন্ধ্যার সময়ে ওঠার দরকারটা কি? বিশ্বাস করলাম তুই পারিস।

উঁহু, তোরা বিশ্বাস করিস না, আমি এখন উঠব।

দীপু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, এটা এমন কি ব্যাপার যে বিশ্বাস করব না?

তার মানে এটা খুব সোজা, তুইও পারবি?

একশো বার পারব।

ওঠ দেখি।

দীপু রেগে বলল, ভাবছিস উঠতে পারব না?

ওঠ না দেখি।

তারিকের উপর নান্টুর অনেকদিনের রাগ, সে তারিককে ক্ষেপানোর জন্যে বলল, এটা আর কঠিন কি আমিও পারব।

নান্টু ছোটখাট হালকা পাতলা। বন্ধু মহলে ভীরু বলে পরিচিত।

যখন সেও বলে বসল যে সে পর্যন্ত উঠতে পারবে তখন তারিক সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেল। চোখ ছোট করে বলল, যদি সত্যি বাপের বেটা হোস, আয় আমার সাথে, ওঠ।

তারিক পানির ট্যাংকের দিকে এগিয়ে গিয়ে সত্যি সত্যি লম্বা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। দীপু নান্টুকে বলল, যা ওঠ।

নান্টু দুর্বল গলায় বলল, ঠাট্টা করে বলেছিলাম।

দীপু বলল, যা পারিস না তা বলতে যাস কেন? গরু কোথাকার!

তারিক অনেকদূর উঠে গেছে, চেঁচিয়ে বলল, বাপের ব্যাটা হলে আয় আর ভয় পেলে থাক বাসায় গিয়ে বার্লি খা গিয়ে।

দীপু ট্যাংকটার দিকে এগিয়ে গেল আর হঠাৎ কি মনে করে নান্টুও পেছনে পেছনে এগিয়ে গেল। সেও উঠবে।

ওঠার আগে দীপু নান্টুকে জিজ্ঞেস করল, সত্যি উঠবি?

হুঁ।

ভয় পেলে থাক—

না, আমি উঠব।

ঠিক আছে ওঠ। দীপু নান্টুকে আগে যেতে দিল। পেছনে পেছনে সেও উঠতে শুরু করে।

ভয়ানক উঁচু পানির ট্যাংকটা। নিচ থেকে বোঝা যায় না। প্রায় আধাআধি ওঠার পর দীপু নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে ছোট ছোট পুতুলের মত দেখাচ্ছে। দেখে মাথা ঘুরে উঠতে চায়। তারিক তর তর করে উঠে যাচ্ছে, নান্টু তর তর করে না উঠলেও বেশ চমৎকার উঠে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লোহার সিঁড়িটা শক্ত করে ধরে রাখতে হচ্ছিল শুধু ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ফসকে যায় হাত আর ছিটকে পড়ে নিচে।

শেষ অংশটুকু সবচেয়ে ভয়ানক। একেবারে খাড়া উঠে গেছে। তারিক পর্যন্ত একটু দ্বিধা করল ওঠার আগে। মাঝামাঝি উঠে আবার একটা হাঁক ঠিকই দিল শুধুমাত্র ওদের দেখানোর জন্যে।

নান্টু শেষ অংশটায় এসে একটু ভয় পেয়ে গেল মনে হয়। সিঁড়ি ধরে ভয়ে ভয়ে উপর দিকে তাকাল, দীপু এসে জিজ্ঞেস করল, ভয় লাগছে?

নান্টু দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।

নেমে যা তাহলে, তোর আর উঠে কাজ নেই।

নান্টুও নেমে যেতে চাইছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে তারিকের গলার স্বর শুনতে পেল, মুরগীর বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

দীপু ধমকে উত্তর দিল, ফ্যাচ ফ্যাচ করবি না বলে রাখলাম।

ভয় করছে নাকি? তারিক ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে ঠাট্টা করে চেঁচাতে লাগল, ও মাগো, ভয় করে গো, বার্লি খাব গো, দুধু খাব গো।

দীপু তারিকের ঠাট্টায় কান না দিয়ে বলল, নান্টু ভয় পেলে নেমে যা।

নান্টু কি মনে করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, না উঠব।

সত্যি?

হুঁ।

দেখিস—

কিছু হবে না।

দীপুকে অবাক করে দিয়ে নান্টু সত্যি সত্যি উঠতে শুরু করল। এক পা এক পা করে নান্টু উঠতে থাকে। প্রত্যেকবার পা তোলার আগে লোহার সিঁড়িটা শক্ত করে ধরে রাখে। একেবারে খাড়া সিঁড়ি, মনে হচ্ছিল পেছন দিকে পড়ে যাবে। ভয়ে বুক ধ্বক ধ্বক করতে থাকে নান্টুর। নিচের দিকে তাকাবে না তাকাবে না করেও শেষ তিনটা ধাপের আগে হঠাৎ নিচের দিকে তাকাল নান্টু, আর তাকানোর সাথেই তার যেন কি একটা হয়ে গেল! কত উপরে সে ঝুলে আছে, আর কত নিচে মাটি, ছোট ছোট গাছপালা বাড়ি-ঘর ছোট ছোট পুতুলের মত লোকজন। মাথা ঘুরে গেল হঠাৎ, নান্টুর

হাত ফসকে যাচ্ছিল একটা চিৎকার করে প্রাণপণে সিঁড়িটা ধরে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

দীপু ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, নান্টু, কি হয়েছে?

নান্টু কোন উত্তর দিল না।

নান্টু, নান্টু, এই নান্টু। কোন উত্তর নেই নান্টুর। দীপু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, কাছে এসে হাত দিয়ে ওর পা ধরে নাড়া দিল দীপু।

একটা অদ্ভুত শব্দ করল নান্টু। দীপু অবাক হয়ে দেখল নান্টু থরথর করে কাঁপছে। ভয়ে দীপুর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল মুহূর্তে।

উপর থেকে তারিকের হাসি ভেসে আসে, কি রে মুরগীর বাচ্চারা উঠিস না কেন? বাড়ি যাবি?

দীপু আবার নান্টুকে ডাকলো, নান্টু, দাঁড়িয়ে থাকিস না, ওপরে ওঠ।

নান্টু কোন উত্তর দিল না, গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ করল।

ওঠ। ওঠ বলছি।

ভাঙা গলায় নান্টু বলল, পারব না।

পারবি না মানে?

নান্টু গোঙাতে গোঙাতে বলল, পারব না— পারব না—

আর অল্প বাকি, উঠে পড়।

পারব না— পারব না— পারব না—

নেমে আয় তাহলে।

পারব না, আমি পারব না।

পারবি না মানে?

উহু, আমি কিছু পারব না।

উপর থেকে তারিক একটু অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে? তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

দীপু বলল, নান্টু বলছে উপরে উঠতে পারবে না।

তাহলে নেমে যায় না কেন?

নামতেও পারছে না।

মানে?

ঠিক তক্ষুনি নান্টু হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

অন্ধকারে, প্রায় দুশ ফিট উপরে সরু লোহার খাড়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেউ যদি কাঁদতে শুরু করে তখন অবস্থাটা কল্পনা করা যায় না। তারিক ভয় পেয়ে বলল, এই দীপু, কাঁদছে কেন নান্টু।

জানি না।

উপরে তুলে আন ওটাকে।

আমি কিভাবে তুলব!

দাঁড়া আমি টেনে তুলছি?

উপর থেকে তাবিক নান্টুর শার্টের কলার ধরে টানতে থাকে আর নিচে থেকে দীপু লোহার মত হয়ে আঁকড়ে থাকা নান্টুর হাত খুলে উপরে ধরিয়ে দিতে লাগল। তারপর সাবধানে পা ঠেলে ঠেলে উপরের সিঁড়িতে তুলে দিল। একই সাথে মুখে ক্রমাগত ধমক আর অনুরোধ করে যেতে থাকে। ওকে তিনটি ধাপ তুলে আনাতে ওদের অন্তত দশ মিনিট সময় লেগে গেল।

উপরে উঠে নান্টু মুখ চেপে শুয়ে পড়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে লাগল। দীপুর মনে হল বুঝি মরেই যাবে।

তাবিক ভারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ওরকম করছে কেন?

বোধ হয় ভয় পেয়েছে।

ভয় পেয়েছে তো উঠেছে কেন?

আমি কি জানি।

যত্তসব ফাজলেমি! মুরগীর বাচ্চার মত ভয় তাহলে উঠতে যায় কেন?

আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন? ওকেই জিজ্ঞেস কর।

দীপু খুব ঘাবড়ে গেল। নিচে থেকে অন্যরা বুঝতে পেরেছিল একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। বাবু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে দীপু?

দীপু কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সন্ধ্যার সময় কয়টি ছেলে পানির ট্যাংকের নিচে দাঁড়িয়ে আছে আবার কয়টি ছেলে এত উঁচু ট্যাংকের উপরে উঠে গেছে, আশেপাশে এমনিতেই লোকজনের ভিড় জমে যাবার কথা। দীপুর সব মিলিয়ে খুব অস্বস্তি লাগতে থাকে। তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি নিচে লোকজনের ভিড় জমে গেছে। কেউ যে ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখছে না তা আর বলতে হল না। আরো বেশি লোক জমে যাবার আগেই একটা কিছু করা দরকার। সে চেঁচিয়ে বলল, তোরা বাসায় চলে যা।

কেন?

যা বলছি, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস না। খবরদার।

যেসব লোক এর মাঝে জমা হয়ে গিয়েছিল তারা জানতে চেষ্টা করল ব্যাপারটি কি। কিন্তু নিচে যারা আছে তারা ব্যাপারটি আসলেই জানে না, অন্যদের কি বলবে। দীপুর কথামত ওরা সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। কৌতূহলী লোকজন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল।

শেষ লোকটি চলে যাবার পর তাবিক বলল, আমি গেলাম।

মানে?

মানে আবার কি? সারারাত বসে থাকব নাকি?

সত্যি সত্যি তারিক উঠে দাঁড়িয়ে নামার আয়োজন করতে থাকে। দীপু নান্টুকে ডাকল, নান্টু কোনমতে উঠে বসে থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওকে নামার কথা বলার কোন অর্থ হয় না, এখানে বসে থেকেই সে একটা অস্বাভাবিক ভয়ে কাঁপছে। কিছু একটা হয়ে গেছে ওর।

দীপু তবু চেষ্টা করে দেখল, বলল, নান্টু, নামবি না?

নান্টু জবাব দিল না। আগের মত কাঁদতে লাগল।

বসে থাকবি নাকি সারারাত?

নান্টু তবু জবাব দিল না, কাঁদাটা, একটু বেড়ে গেল শুধু।

আমরা গেলাম তাহলে।

নান্টু একটু জোরে কেঁদে উঠল এবার।

তারিক বিরক্ত হয়ে বলল, আমি জানি না বাপু। তোর যা ইচ্ছে হয় কর। আমি যাচ্ছি।

এই তারিকের জন্যেই যত গণ্ডগোল। দীপু এবার তারিকের উপর রেগে উঠে। কিন্তু রেগে তো আর সমস্যার সমাধান হয় না। সত্যি সত্যি যদি নান্টু নামার সাহস না পায় তাহলে অবস্থাটা কি হবে ভাবতে পারে না।

তারিককে খুব বেশি চিন্তিত মনে হল না। সে দীপুর উপর সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। উপর থেকে দেখল তারিক শিস দিতে দিতে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে রাস্তা ধরে।

দীপু একা একা বসে রইল নান্টুকে নিয়ে। অনেক বুঝিয়ে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়েও কোন লাভ হল না। নান্টু ঐভাবে বসে কেঁদে যেতে লাগল। দীপু বুঝতে পারছিল ও ঠিক স্বাভাবিক নেই, হঠাৎ খুব বেশি ভয় পেয়ে একটা কিছু ঘটে গেছে ওর ভেতর। কিন্তু বুঝেই বা লাভ কি। আরো কিছুক্ষণের ভেতর নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। তখন কি হবে সে ভেবে পায় না। এক হতে পারে সে নিজে নেমে গিয়ে নান্টুর বাসায় খবর দিয়ে পালিয়ে যায় তারপর নান্টুর বাসার লোকজন যা ইচ্ছে হয় করুক! কিন্তু পরমুহূর্তে সে এটা উড়িয়ে দেয়। পুরো ঘটনার দায়িত্ব ওকেও নিতে হবে। আব্বাকে জানালে আব্বা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন কিন্তু তার আগে তার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে। ওর আব্বা ওকে যত স্বাধীনতা দিয়েছেন তত স্বাধীনতা আর কাউকে কারো আব্বা দেননি। স্বাধীনতা পেয়ে যা ইচ্ছে করে ঝামেলা বাধিয়ে আব্বার কাছে হাজির হওয়ার থেকে লজ্জার কি আছে? আব্বা হয়ত কিছু বলবেন না— হয়ত ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাবেন, দীপু বুঝতে পারে ও তার আব্বার সামনে লজ্জায় মরে যাবে তাহলে। তার ইচ্ছে হল বসে বসে খানিকক্ষণ কেঁদে নেয়।

প্রায় আধঘন্টা পরে হঠাৎ দীপু নিচে থেকে তারিকের গলার স্বর শুনতে পেল, হেই, হেই দীপু।

কি?

এখনও আছিস তোরা।

আছিই তো। কি করব না হলে?

নান্টু এখনও কাঁদছে?

হ্যাঁ।

লাথি মেরে ফেলে দে নিচে।

দীপুরও তাই ইচ্ছে করছিল কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর ফেলে দেয়া যায় না।

কি করবি এখন?

জানি না। দীপু চিন্তিত মুখে বলল, আমার আব্বাকে খবর দিতে পারবি একটু?

মাথা খারাপ। আমি ওসবের মাঝে নাই।

তারিক চলে গেল না, নিচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বলল, তুই দাঁড়া আমি আসছি।

বেশ খানিকক্ষণ পর তারিক এক গাছা দড়ি নিয়ে ট্যাংকের উপরে উঠে আসে। দীপু ভারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, দড়ি দিয়ে কি করবি?

হারামজাদার গলায় বেঁধে লটকে দেব।

যাঃ। ফাজলেমি করিস না, কি করবি বল।

নান্টুকে ঘাড়ে করে নামাব। কিন্তু হারামজাদাকে বিশ্বাস নাই। ওটাকে পিঠে তুলে নেবার পর তুই শক্ত করে আমার শরীরের সাথে বেঁধে দিবি।

দীপুর চোখ কপালে উঠে গেল। হাঁ হয়ে বলল, তুই নান্টুকে ঘাড়ে করে নামাবি? এখান থেকে?

হ্যাঁ।

মাথা খারাপ?

বকবক করিস না। এছাড়া কি করবি?

সত্যি কিছু করার নেই। কিন্তু নান্টুকে ঘাড়ে করে প্রায় দুশো ফিট খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া কি সোজা কথা! দীপু ভাবতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল, বলল, তারিক বেশি বাড়াবাড়ি করতে যাসনে। একটা কিছু হয়ে গেলে—

তুই ভ্যাদর ভ্যাদর করবি না। আমি তোদের মত ডিম মাখন খাওয়া বড় লোকের ন্যাদান্যাদা বাচ্চা না! ছোটলোকের পোলা আমি— ওই হারামজাদার মত দু চারটা বোঝা আমি ঘাড়ে করে মাইল মাইল যাই রোজ।

দীপু চুপ করে রইল। সত্যি যদি সে সাহস করে তাহলে ঠিকই নেমে যাবে।

নান্টু কিছুতেই তারিকের পিঠে উঠতে রাজি হচ্ছিল না। দীপু নিজেও ওরকম অবস্থায় কখনো রাজি হতো না। কিন্তু ওকে রাজি করানোর জন্যে তারিক যে কাজটি করল সেটির তুলনা নেই! পকেট থেকে একটা ছোট চাকু বের করে চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, যদি পিঠে না উঠিস, চাকু মেরে দেব শালার!

অন্ধকারে তারিকের চকচকে চোখ আর হিসহিসে গলার স্বর শুনে নান্টু সত্যি ভয়

পেয়ে গেল। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে চাইছিল তার আগেই তারিক চাকুটা গলার মাঝে ধরল। বলল, খবরদার, খুন করে ফেলব হারামির বাচ্চা।

নান্টু শুকনো মুখে খাবি খেতে খেতে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে লাগল তারপর বাধ্য ছেলের মত তারিকের পিঠে উঠল। দীপু খুব শক্ত করে নান্টুকে তারিকের সাথে বেঁধে দিল যেন ভয়ে ছেড়ে দিলেও পড়ে না যায়। তারিক কোথা থেকে গরুর দড়ি খুলে এনেছে ছিঁড়ে যাবার ভয় নেই।

তারিক নামতে শুরু করার আগে হঠাৎ দীপুর ভীষণ ভয় করতে লাগল। ওটার সময় দেখেছে খাড়া সিঁড়িতে সবসময় মনে হয় পেছন দিকে কে যেন টানছে, হাত একটু ঢিল করলেই বুঝি পড়ে যাবে। শক্ত করে ধরে রাখতে রাখতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। এর মাঝে কেউ যদি কাউকে পিঠে নিয়ে নামতে চেষ্টা করে তাহলে যে কি ভয়ানক লাগবে সে চিন্তাও করতে পারে না। কিন্তু তারিক যখন সত্যি সাহস করছে তখন ওর কিছু বলার নেই। আস্তে আস্তে বলল, তুই আগে নিচে নামবি না আমি?

তুই আগে শুরু কর। একটু ঝামেলা টামেলা হলে ইয়ে করিস।

আচ্ছা। ঘাবড়াস না— আমি থাকব তোর নিচে নিচে।

দীপু নামতে শুরু করে। নিচে— কত নিচে কে জানে গাছপালা ছোট ছোট ঘর বাড়ি! কত ওপরেই না ওরা দাঁড়িয়ে আছে! সিঁড়ি বেয়ে দু তিন ধাপ নেমে ও দাঁড়ায়, তারিককে ডেকে বলল, এবারে তুইও নাম।

নামছি, বলে তারিক নামার জন্যে এগিয়ে আসে। দীপু উপরে তাকাতে পারছিল না ভয়ে। কিন্তু তারিকের সাহস আছে সত্যি, ঠিকই সিঁড়িতে পা দিয়ে নামতে শুরু করে দিল। মুখে বলতে লাগল, নান্টু হারামজাদা যদি একটু নড়িস তাহলে শুয়োর হাত ফসকে যাবে, আমি তো মরবই তুইও মরবি—

নান্টু কোন শব্দ করছিল না, শব্দ করার মত সাহস বা ইচ্ছে কোনটাই নেই।

তারিক এক পা এক পা করে নামতে থাকে, সাথে সাথে দীপুও, তারিক নিচে তাকাতে পারছিল না যতটুকু সম্ভব সোজা হয়ে সিঁড়ির সাথে মিশে নামতে হচ্ছিল। দীপু সাবধানে মাঝে মাঝে তারিকের পা সিঁড়িতে লাগিয়ে দিচ্ছিল। খুঁজে সিঁড়ির ধাপ না পেয়ে তারিকের পা ফসকালে হাত দিয়ে ধরে কখনই তাল সামলাতে পারবে না। কত নিচে নামতে হবে কে জানে! দীপুর কাছে একেকটি মুহূর্ত মনে হচ্ছিল একেকটি বছর।

উপর থেকে আবার তারিকের গলার স্বর শোনা গেল। দেখে তো মনে হয় শুকনো, শালার ওজন তো ঠিকই আছে। কি খাস হারামজাদা? সীসা নাকি? বাবাগো! হাত না ছিঁড়ে যায়। খবরদার— খবরদার— নান্টু নড়বি না। তুই মরতে চাস মরিস আমার কোন আপত্তি নেই, আমাকে নিয়ে মরিস না।

নান্টু কোন উত্তর দিল না, উত্তর দেয়ার মত অবস্থাও নেই।

প্রথম অংশটুকু সবচেয়ে ভয়ানক, একেবারে খাড়া আর ভয়ানক লম্বা। একসময়ে সেটা শেষ হয়ে গেল। পরের অংশটুকু শুরু হবার আগে খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে

ঘেরা, পা ছড়িয়ে বসাও যায় ইচ্ছে হলে। তারিক নেমে এসে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে থাকে ভীষণ পরিশ্রম হয়েছে ওর। পরিশ্রম থেকে বড় কথা সারাক্ষণ পড়ে যাবার ভয়ে তারিক গলগল করে ঘামছিল।

দীপু জিজ্ঞেস করল, একটু বিশ্রাম নিবি?

বিশ্রাম? এই হারামজাদাকে ঘাড়ে নিয়ে বিশ্রাম নেব কেমন করে?

খুলে দিই কিছুক্ষণের জন্যে?

নাহ! থাক, খোলা আবার বাঁধা অনেক ঝামেলা। নে শুরু কর।

আবার নামতে শুরু করে ওরা। প্রথম প্রথম তারিক নান্টুকে গালিগালাজ করছিল মাঝে মাঝে দীপুর সাথে কথা বলছিল। আস্তে আস্তে তার গলার স্বর থেমে গিয়ে শুধু লম্বা লম্বা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে থাকে। নান্টুকে ঘাড়ে করে নিয়ে নামতে যে কি পরিমাণ পরিশ্রম হচ্ছে দীপু খুব ভাল করে বুঝতে পারে।

কতক্ষণ লেগেছিল কে জানে। শেষ ধাপটা নেমে দীপুর ইচ্ছে করছিল আনন্দে চিৎকার করে উঠতে। তারিক টলতে টলতে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে বলে, খুলে দে তাড়াতাড়ি।

দীপু তাড়াতাড়ি খুলে দিতে চেষ্টা করে। খুব শক্ত হয়ে এঁটে গিয়েছিল তাই তারিকের কাছ থেকে চাকু নিয়ে দড়ি কেটে নান্টুকে আলগা করল। সাথে সাথে তারিক লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে।

নান্টু অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল, তখনও ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল, কি জন্যে কে জানে!

দীপু তারিককে জিজ্ঞেস করল, বাতাস করব খানিকক্ষণ?

তারিক হাত নেড়ে না করল। দীপু তবুও শার্ট খুলে বাতাস করতে থাকে। তারিকের জন্যে একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছিল ওর।

তারিকের উঠে দাঁড়াতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল। বার কয়েক হাত পা ছুঁড়ে একটু তাজা হয়ে দীপুকে বলল, বাড়ি যা এখন, যাব খাবি গিয়ে। কত রাত হয়েছে দেখেছিস? তারপর নান্টুকে ডাকল ঠাণ্ডা গলায়, নান্টু শোন।

কি?

শোন বলছি।

নান্টু ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে আসে আর কিছু বোঝার আগেই পেটে প্রচণ্ড এক ঘুঁসি!

বাবাগো বলে নান্টু নাক মুখ চেপে পেটে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। তারিক ওর দিকে না তাকিয়ে হালকা শিস দিতে দিতে হেঁটে চলে গেল।

দীপু খানিকক্ষণ তারিককে চলে যেতে দেখল। তারপর নান্টুকে ঘাড় ধরে টেনে তুলে। হাসতে হাসতে বলল, কাঁদিস না বেকুব কোথাকার। আমি হলে অন্তত দশটা ঘুঁসি মারতাম, তারিক তো মোটে একটা মারল!

সে রাতে ঘুমাতে গিয়ে দীপুর হঠাৎ ওর আব্বার কথা মনে পড়ল। ওর আব্বা বলেছিলেন যদি ওর কখনো তারিককে ভাল লেগে যায় তাহলে তারিকেরও ওকে ভাল লাগবে, প্রাণের বন্ধু হয়ে যাবে দুজন। এখন তো ওর তারিককে খুব ভাল লাগছে, যত রাগ ছিল সব চলে গিয়েছে। তারিকের কি ওকে এখন ভাল লাগবে। না লাগলেও সে আর কিছু মনে করবে না কাল ভোরেই তারিকের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলবে।

দুদিন হল দীপু লক্ষ্য করছে তার আব্বা কি নিয়ে যেন খুব চিন্তিত। যতক্ষণ বাসায় থাকেন সবসময় এঘর থেকে ওঘরে হাঁটতে থাকেন। অনেক সময় হাতে সিগারেট নিয়ে বসে থাকেন, টানতে পর্যন্ত মনে থাকে না, সিগারেটে লম্বা ছাই জমে টুপ করে মেঝের ওপর পড়ে। দীপুর অস্বস্তি লাগে যখন হঠাৎ করে বুঝতে পারে তার আব্বা কেমন করে জানি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে দেখেছে, আব্বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বলেছেন, না, কিছু হয়নি।

রাতে হঠাৎ দীপুর ঘুম ভেঙে যায়, বুঝতে পারে আব্বা তার মাথার কাছে চুপচাপ বসে আছেন। খুব আস্তে আস্তে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। দীপু ঘুমিয়ে থাকার ভান করে শুয়ে রইল যদিও ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আব্বার হাত ধরে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে।

আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। ওর মনে আছে একবার প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কাঁচের জানালা দিয়ে বিদ্যুৎ ঝলকের সাথে দেখতে পাচ্ছিল প্রচণ্ড ঝড়ে গাছগুলো মাতামাতি করছে, দেখে মনে হয় গাছগুলো যেন মানুষ — যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ঝড়কে ও ভয় পায় না, কিন্তু সে রাতে কেন জানি ওর ভয় ভয় লাগছিল। শুধু ভয় নয় তার কেমন জানি মন খারাপ লাগছিল, বুকের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল ওর। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ঠিক সেসময় আব্বা পাশের ঘর থেকে উঠে এসে ডাকলেন, বাবা দীপু ঘুমিয়ে আছিস?

ও বলল, না আব্বা, আমার ভয় লাগছে।

ভয় কি বাবা, বলে আব্বা বিছানায় ওর পাশে এসে বসলেন আর ও বাচ্চা ছেলের মত ওর আব্বার বুকের মাঝে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। আব্বার শরীরের ঘ্রাণ ওর কত চেনা, ওর তখন যে কি ভাল লাগছিল। শক্ত করে আব্বাকে ধরে ও শুয়ে রইল, সব ভয় যে ওর কোথায় চলে গেল।

আজ রাতেও দীপুর ইচ্ছে ওর আব্বাকে ধরে শুয়ে থাকতে। কিন্তু কেন জানি ও তবু চুপ করে শুয়ে রইল। শুনতে পেল আব্বা খুব ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেন জানি দীপুর ভারি মন খারাপ হয়ে গেল।

সকালে স্কুলে যাবার আগে আব্বা ওকে বললেন, দীপু তোর আজ স্কুলে যেতে



হবে না।

দীপু একটু ভয় পেয়ে বলল, কেন, আব্বা?

কাজ আছে একটু।

আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। স্কুল খোলা অথচ আব্বা তাকে নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরতে চলে গেলেন। একবার কি একটা পরীক্ষা পর্যন্ত দেয়া হল না, রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল শেষে। আব্বা হেসে বললেন, রেজাল্ট খারাপ হলে কি হয়? বেশি ভাল রেজাল্ট হলে অহংকারী হয়ে যাবি, ভাববি আমি কি হনু রে।

অথচ আজ সে আব্বাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করতে পারল না কি কাজ। একটা চাপা ভয় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটু পরেই আব্বা তাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। বিছানায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন চুপচাপ। দীপুকে একেবারে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন। সচরাচর ওরকম করেন না। দীপু একটু অবাক হল। আব্বা আস্তে আস্তে বললেন, দীপু, আজ তোকে একটা জিনিস বলব।

দীপু কেন জানি খুব ভয় পেয়ে গেল। শুকনো গলায় বলল, কি?

আব্বা তবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন. তারপর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই জানিস যে তোর আম্মা মারা গেছেন, না?

দীপু ফ্যাকাসে মুখে মাথা নাড়ল।

আসলে —

দীপু ভয়ানক চমকে উঠে বলল, আসলে কি?

আসলে তোর আম্মা এখনও বেঁচে আছে।

কয়েক সেকেন্ড দীপু কিছু বুঝতে পারল না, শূন্য দৃষ্টিতে আব্বার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ও বুঝতে পারল আব্বা কি বলছেন। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, ভাঙা গলায় বলল, কি বললে?

আব্বা ওকে শক্ত করে বুকে ধরে রাখলেন, আস্তে আস্তে বললেন, আমি তোকে এতদিন মিছে কথা বলে এসেছি দীপু। আসলে তোর আম্মা এখনও বেঁচে আছে।

দীপু কোনমতে বলল, কোথায়?

আমেরিকা। তোর জন্মের পর তোর আম্মা আর আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। তোর মা তোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি দিইনি। তোকে আমার কাছে রেখেছি।

আব্বা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, তার কয়দিন পর তোর মা আমার এক বন্ধুকে বিয়ে করে আমেরিকা চলে গেছে। তার আরো দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে বলে শুনেছি। এতদিন তোকে আমি কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম যদি তোকে জানতে দিই যে তোর মা বেঁচে আছে তাহলে হয়ত শুধু শুধু কষ্ট পাবি।

দীপু চুপ করে রইল। কেন জানি তার চোখে পানি এসে গেল। তার মা বেঁচে আছেন অথচ একটিবার তার কথা মনে করলেন না? একটিবার তাকে দেখতে চাইলেন

না?

আব্বা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তোকে আমি খুব শক্ত করে মানুষ করছি দীপু, যখন বড় হবি তখন দেখবি ছোটখাট দুঃখ কষ্টকে ভয় পাবি না। তোকে এতদিন তোর মায়ের কথা বলিনি ভেবেছিলাম বড় হলে বলব। কিন্তু —

কিন্তু কি?

সেদিন তোর মায়ের একটা চিঠি পেলাম, ও ঢাকা এসেছে কয়েকদিনের জন্যে।

দীপু ভয়ানক চমকে উঠে ওর আব্বার দিকে তাকাল, ওর আম্মা তাহলে ঢাকাতে আছেন? আব্বা আস্তে আস্তে বললেন, তোকে একবার দেখতে চায়।

দীপুর দুচোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসে। আব্বা আস্তে আস্তে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, আমি না করে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম যে তোকে তোর মায়ের কথা জানতে দিইনি, চাই না জানুক। মা ছাড়াই ও মানুষ হোক। কিন্তু ক'দিন থেকেই আমার মনে হচ্ছে, কাজটা কি ভাল করলাম? আমার নিজের মা আমাকে যা আদর করত! তোর মাও নিশ্চয়ই তোর জন্যে খুব ফীল করে, আদর করার সুযোগটা আর পায় না!

আব্বা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোর মা আবার আগামীকাল রাতে আমেরিকা চলে যাচ্ছে, আর হয়ত আসবে না। তাই আমি ভাবছিলাম যদি তোকে এবারে তার সাথে দেখা করতে না দিই হয়ত আর কোনদিন তোদের দেখা হবে না। যাবি তোর মাকে দেখতে?

দীপু আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, আব্বাকে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। আব্বা খুব আস্তে আস্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। মৃদু গলায় বললেন, যাবি তোর মায়ের সাথে দেখা করতে? তাহলে আর দেরি করিস না বাবা। বারটার সময় ট্রেন ছাড়বে, কাল খুব ভোরে পৌঁছে যাবি ঢাকা।

তুমি যাবে না?

আব্বা একটু হেসে বললেন, কেন তুই একা যেতে পারবি না?

দীপু ঘাড় নাড়ল, পারব।

দীপু ঢাকা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল খুব ভোরে। ঢাকায় ও আগে যখন এসেছে তখন সাথে ছিলেন আব্বা, এবারে ও একা একা। ঘুরে বেড়াতে তার কখনো কোন ভয় লাগে না, বরং ভালই লাগে। এবারে ব্যাপারটি অবিশ্যি অন্যরকম। ট্রেনে ঘুমানোর জায়গা পেয়েছিল তবু সারারাত একটুও ঘুমাতে পারেনি। ও যতবার চোখ বন্ধ করেছে ততবার আম্মার ছবি দেখতে পেয়েছে। ও জানত না ওর আব্বার কাছে ওর আম্মার একটা ছবি ছিল। আগে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিল আব্বা বলেছিলেন নেই। এবারে জিজ্ঞেস করার পর ট্রাঙ্ক খুলে একটি ছবি বের করে আনলেন। ছবিতে ওর আব্বাকে দেখাচ্ছে খুব কম বয়স পাশে ওর আম্মা। আর ওর আম্মার কোলে সে নিজে। একেবারে ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা। ওর আম্মা কি হাসছেন, মনে হচ্ছে বুঝি হাসির শব্দ

শুনতে পাওয়া যাবে। আর ওর আব্বা বাচ্চা ছেলের মত জোর করে হাসি চেপে আছেন যেন ভারি একটা মজার ব্যাপার আছে, কাউকে বলা যাবে না। ছবিটি দেখে ওর অভিমানে গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কোনমতে আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আব্বা, তোমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কেন?

আব্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ছাড়াছাড়ি যে কেন হল তোকে বোঝানো মুশকিল।

ঝগড়া হয়েছিল?

হুঁ। অনেকটা ঝগড়ার মতই।

কেন ঝগড়া করলে তোমারা? প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করতে পারেনি। ওর আম্মার সাথে দেখা হলে সে জিজ্ঞেস করে দেখবে। দীপুর আবার চোখে পানি এসে যায়।

স্টেশনের বাথরুমে দীপু দাঁত ব্রাশ করে পরিষ্কার হয়ে নিল। আয়নায় ও দেখতে পেল ওর চোখ লাল আর চুল উষ্কখুষ্ক। মিছেই হাত দিয়ে কয়েকবার চুল ঠিক করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল।

আব্বা ঠিকানা লিখে দিয়েছেন সেটা বুক পকেটে আছে। কিন্তু এতবার ও ঠিকানাটা পড়েছে যে মুখস্থ আছে ওর। ও বাইরে এসে একটা রিক্সা ঠিক করল। অনেকদূর এখান থেকে। অন্য সময় হলে সে ঠিক খুঁজে খুঁজে বাস বের করে ফেলত। এবারে ওর বাসে যেতে ইচ্ছে করছিল না— একা একা রিক্সা করে যেতে ইচ্ছে করছিল।

ঢাকা যতবার এসেছে ততবারই ওর খুব ভাল লেগেছে; যখনই নতুন কোন জায়গায় যায় ওর চোখ ঘুরিয়ে দু পাশে দেখতে খুব ভাল লাগে। কত মজার মজার দোকানপাট, বাড়িঘর, কত মজার মজার লোকজন। এবারে ও কিছুতেই মন দিতে পারছিল না। ওর কেমন জানি ভয় ভয় লাগছিল আর অদ্ভুত একটা অভিমান হচ্ছিল। কার ওপর কে জানে। ওর আম্মা কেমন, দেখা হলে প্রথমে কি বলবে সে ঠিক করতে পারছিল না। যদি ওর নাম শুনে চিনতে না পারেন তাহলে সে কি বলবে?

বাসা খুঁজে পেতে একটু দেরি হল বলে দীপু রিক্সাওয়ালাকে একটু বেশি পয়সা দিল। বুড়ো রিক্সাওয়ালা একগাল হেসে চলে যাবার পর ও একা একা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাসাটি ভারি চমৎকার। মস্ত বড় লোহার গেট হাঁ করে খুলে রেখেছে, ভেতরে ফুলের বাগান, দুটি চকচকে গাড়ি। একটা বিরাট বড় আরেকটা ছোট, লাল টুকটুকে উপরের বারান্দায় ছোট ছোট সুন্দর ছেলেমেয়েরা লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে। কে জানে হয়ত কোন একজন তার ভাই কিংবা বোন।

এত সুন্দর ঝকঝকে বাসায় ওর নিজেকে ভারি বেমানান লাগছিল কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আরো বাজে ব্যাপার। সে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই একটা কলিং বেল দেখতে পেল। একটু দ্বিধা করে ও বোতাম টিপে ধরল। ভাবছিল কড়কড় করে বুঝি বেজে উঠবে কিন্তু শুনতে পেল ভেতরে মিষ্টি বাজনার মত

একটু শব্দ হল।

একটি ছেলে দরজা খুলে দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি খোকা কাকে চাই?

দীপু ঢোক গিলে বলল, মিসেস বওশান বাসায় আছেন?

আছেন। ভেতরে এস।

দীপু ছেলেটার পিছে পিছে এসে বলল, আমি তার সাথে একটু দেখা করতে চাই।

ও। ভাবী তো খুব ব্যস্ত, আজ চলে যাবেন কিনা! কি দরকার বলতে পারবে?

দীপু আস্তে আস্তে বলল, আমার ঠিক কোন দরকার নেই, শুধু একটু দেখা করতে এসেছি। একটু ডেকে দেবেন?

বেশ। ছেলেটা ভেতরে চলে গেল।

তার বয়েসী বেশ কজন ছেলেমেয়ে কার্পেটে বসে কি একটা যেন খেলছিল। বড় লোকের ছেলেমেয়েরা এগুলো দিয়ে খেলে। অনেকেই কথা বলছিল ইংরেজিতে। দীপুকে একনজর দেখে সবাই আবার খেলায় মন দিল।

দীপু কি করবে বুঝতে না পেরে একপাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। কি সুন্দর করে সবকিছু সাজানো। লাল ভারী পর্দা, দেয়ালে বিরাট বড় বড় চমৎকার সব ছবি, শো কেসে সুন্দর সুন্দর সব পুতুল আর হাজার হাজার বই। একপাশে ছোট খেলনার মত একটা টেলিফোন। একটা মস্ত টেলিভিশন আর পাশে আরো কত কি, ও সবকিছুর নামও জানে না।

ঠিক তখনি পর্দা সরিয়ে সেই ছেলেটি আর তার পেছনে পেছনে একজন খুব সুন্দরী ভদ্রমহিলা এসে ঢুকলেন। হাতে টুকটুকে একটা লাল ফ্রক হয়তো কিছু ঠিক করছিলেন। দীপুকে দেখে বললেন, খোকা তুমি আমার খোঁজ করছ?

দীপু মাথা নাড়ল, বলল, হ্যাঁ। তারপর ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি দীপু।

দীপু দেখল মুহূর্তে ওর আম্মার সারা মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। থর থর করে কেঁপে উঠলেন। হাত থেকে লাল ফ্রকটি পড়ে গেল মেঝেতে। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন দুই পা, তারপর বাচ্চা মেয়ের মত হাঁটু ভেঙে বসে পড়লেন। আম্মা কাঁপা কাঁপা হাতে ওকে কাছে টেনে আনলেন, বিস্ফোরিত চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর কিছু বোঝার আগে ওকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। দীপু কাঁদবে না কাঁদবে না করেও কিছুতেই চোখের পানি আটকাতে পারল না।

ওর আম্মা যখন ওকে ছাড়লেন তখন ওর শার্টের কলার, বুক ভিজে গেছে ওর আম্মার চোখের পানিতে। কেঁদে ফেলেছে বলে ওর একটু লজ্জা লাগছিল, ঘরে তাকিয়ে দেখল বাচ্চারা কেউ নেই, সারা ঘরে শুধু সে আর তার আম্মা। কেউ কেউ উঁকি মেরে দেখছে পর্দার ফাঁক দিয়ে।

আম্মা খানিকক্ষণ ওকে তাকিয়ে দেখেন, চুলে হাত বুলিয়ে দেন, তারপর কাছে

টেনে এনে মুখে চুমু দিয়ে বাচ্চার মত আদর করেন। তারপর আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, চিবুক, গাল, চোখে হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন। তারপর আবার হু হু করে কেঁদে ওঠেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, বাপ আমার, এতদিন পরে আমাকে দেখতে এলে?

দীপু কি বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নিচু করে বসে রইল। আম্মা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, কখন এসেছ?

একটু আগে।

তোমার আব্বা কোথায়?

বাসায়।

তুমি কার সাথে এসেছ?

একা।

একা? আম্মা একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ ওর চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে আবার হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, খাওয়া হয়নি তোমার, না?

উঁহুঁ। খেয়েছি আমি স্টেশনে।

কি খেয়েছ?

পরোটা আর মিষ্টি। বলতে গিয়ে কেন জানি ওর লজ্জা লাগল।

আম্মা বললেন, ঠিক আছে তবু এসো হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে কিছু খাবে।

দীপুর কেন জানি ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছিল না। অপরিচিত লোকজন ওর ভাল লাগে না। ও আস্তে আস্তে বলল, আমি হাত মুখ ধুয়ে এসেছি আর আমার একটুও খিদে পায়নি।

আম্মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না, না?

দীপু মাথা নড়ল। আম্মা বললেন, ঠিক আছে তাহলে বসো এখানে, আমি আসছি।

আম্মা ভেতরে গেলেন তারপর সাথে সাথেই ফিরে আসলেন দুটি ফুটফুটে বাচ্চা নিয়ে, একজন ছেলে একজন মেয়ে। আম্মা ছেলেমেয়ে দুটিকে বললেন, রুমী, লিরা, এ হচ্ছে দীপু, তোমাদের বড় ভাই।

ছেলেটি আর মেয়েটি মেশিনের মতো বলল, হ্যালো।

দীপু কি করবে বুঝতে না পেরে একটু হাসল। আম্মা বললেন, তোমরা কথা বলো, আমি আসছি।

দীপু এদের মাঝে বড়, কাজেই ওরই কথা শুরু করা দরকার, অথচ কি বলবে বুঝতে পারছিল না। ও কিছু বলার আগেই ছেলেটা খুব গম্ভীর হয়ে সোফায় বসে

জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাদের ভাই?

দীপু মাথা নেড়ে হাসল।

ভেরী স্ট্রেঞ্জ।

কি?

হেভিং এ স্টেপ ব্রাদার ইজ রাদার স্ট্রেঞ্জ।

মেয়েটি একটু হেসে উঠে ওর ভাইকে বলল, হি ইজ কিউট। ইজনট হি?

ভাইটি চোখ পাকিয়ে বোনের দিকে তাকাল তারপর দীপুকে বলল, শী ইজ ইমম্যাচিওরড। ডাজনট নো হাউ টু টক!

এত ছোট বাচ্চা এমন সুন্দর টক টক ইংরেজি বলছে যে ওর খুব অবাক লাগে। দেখতে এত সুন্দর দুজনেই যে দীপুর আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সত্যি সত্যি যদি ওর দুজন ভাইবোন থাকত ওদের যে সে কি আদরই না করত!

এমন সময় ওর আম্মা বেরিয়ে আসলেন, হাতে একটা বড়সড় ব্যাগ। ছেলেমেয়ে দুজনকে বললেন, তোমরা নিজেদের জিনিসপত্র ঠিক করে নাও, আমার আসতে দেরি হবে, ড্যাড এর কথা শুনো।

ছেলেটি বলল, ওকে মম। ওর আম্মা মাথা নিচু করলেন আর ছেলেমেয়ে দুজন চুক চুক করে দুগালে চুমু খেয়ে ভেতরে চলে গেল।

আম্মা দীপুকে বললেন, চলো।

কোথায়?

বাইরে কোথাও।

আম্মা ওর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলেন। ছোট লাল টুকটুকে গাড়িটার দরজা খুলে দিলেন আম্মা, ও ভেতরে গিয়ে বসল। ড্রাইভার নেই দেখে দীপু অবাক হচ্ছিল। যখন দেখল ওর আম্মাই ড্রাইভারের সীটে বসেছেন তখন সে আরো অবাক হয়ে গেল। ওর আম্মা গাড়িও চালাতে পারেন।

দীপু গাড়ি চড়তে খুব ভালবাসে। খোলা একটা জীপে বসে শাঁ শাঁ করে পাহাড়ের মাঝে একটা রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে এরকম একটা ছবি প্রায়ই সে কল্পনা করে কিন্তু ও গাড়ি চড়েছে খুব কম, এভাবে তো কখনোই চড়েনি। শুধু তার জন্যে তার আম্মা গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ও চোখের কোনা দিয়ে তার আম্মাকে দেখার চেষ্টা করল। কি আশ্চর্য! তার নিজের আম্মা।

দীপু।

উঁ।

একটা কিছু বলো।

কি বলব?

আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমার উপর রাগ করে আছো না?

দীপু আস্তে আস্তে বলল, কেন?

তোমাকে ছেড়ে চলে গেছি ভাই।

আমি তো জানতাম না। আব্বা কখনো বলেননি।

যখন বলেছে তখন?

তখন একটু দুঃখ হয়েছে, রাগ হবে কেন?

আম্মা এক হাতে ওকে ধরে টেনে নিলেন। দীপুর একটু ভয় হচ্ছিল, এক হাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়? ওর আম্মার শরীরে কেমন মিষ্টি একটা গন্ধ। মায়েদের শরীরে বুঝি এরকম গন্ধ হয়?

শাঁ করে একটা ট্রাক পাশ দিয়ে চলে গেল। আম্মা ওকে ছেড়ে দিয়ে আবার দুহাতে স্টীয়ারিং ধরলেন। বললেন, এখানে গাড়ি চালাতে কেমন জানি লাগে। ওখানে রাস্তার ডান দিক দিয়ে চালাই তো।

ওখানে সবাই ডান দিক দিয়ে যায়?

হ্যাঁ।

ওখানে গাড়ি খুব বেশি?

বেশি মানে এত গাড়ি চিন্তা করা যায় না, দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। তাই একবার ঢাকা আসলে আর ফিরে যেতে মন চায় না। নিজের দেশের থেকে ভাল দেশ আছে কোথাও?

আম্মা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দীপু।

কি?

যাবে আমার সাথে?

দীপু চুপ করে রইল।

যাবে আমেরিকায়? ওখানে পড়বে?

দীপু আস্তে আস্তে বলল, এখন যাব না, বড় হয়ে যাব।

এখন যাবে না কেন।

না, এখন যাব না।

কেন?

দীপু উত্তর দিতে পারল না, যদিও ও কারণটা জানে। ও ওর আব্বাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আম্মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বায়তুল মোকাররমের পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে আম্মা দীপুকে বললেন, এসো দীপু।

দীপু নামতে নামতে বলল, কোথায়?

এসো তো, একটু ঘুরে বেড়াই।

আম্মা ওকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। একটা খুব বড় দোকান দেখে ওর পিঠে হাত দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। সুন্দর সুন্দর খেলনা, কাপড়, জামা সাজিয়ে রাখা হয়েছে শো কেসের ভেতর। বড় বড় এরকম খেলনার

দোকানে ঘুরে বেড়াতে ওর খুব ভাল লাগে। চট্টগ্রাম থাকার সময় একটা দোকানে একটা হাতি দেখেছিল, চাবি দেয়া, থপ থপ করে হেঁটে যেত। সে ভারি মজার ব্যাপার।

আম্মা একটা শার্ট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দীপু তোমার এই শার্টটা ভাল লাগে?

খুব সুন্দর শার্ট ভাল না লাগার কোন কারণ নেই। দীপু মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

তোমাকে কেমন সুন্দর মানাবে, বলো দেখি।

না—

কি?

আমি এত সুন্দর আর এত দামী শার্ট পরতে পারব না।

আম্মা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, তুমি আমাকে ঘেন্না কর দীপু? তাই আমার থেকে কিছু নিতে চাইছ না?

দীপু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে ওর আম্মার হাত ধরে ফেলল। ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না, না, ছিঃ। আমি ঘেন্না করব কেন? তারপর বলতে গিয়েও বলতে পারল না, মানুষ কি তার মাকে ঘেন্না করতে পারে কখনো?

তাহলে আমার থেকে কিছু নিতে চাইছ না কেন?

কে বলল নিতে চাই না? আমি শুধু জামা কাপড়ের কথা বলছি। এত সুন্দর আর দামী কাপড় কখনো পরতে পারব না। আমার লজ্জা লাগে পরতে।

লজ্জা লাগে?

দীপু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমার স্কুলের সব ছেলেরা, পাড়ার সব ছেলেরা আমার মত, আমি তার মাঝে এরকম ফুলওয়ালা সুন্দর শার্ট পরতে পারব না। বোকা বোকা লাগবে।

আম্মা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আর দীপু আরো অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। থতমত খেয়ে বলল, আমি যদি আমেরিকা থাকতাম কমীদের মতো তাহলে এরকম সুন্দর কাপড় পরতে হত, এছাড়া আমাকে তো প্লেনেই উঠতে দেবে না। কিন্তু এখন সত্যি আমার দরকার নেই—

আম্মা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ওর পিঠে হাত দিয়ে ওকে বের করে আনলেন।

ওরা দুজন স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল আর আম্মা ওকে হাজার রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। কোন্ স্কুলে পড়ে, পরীক্ষায় কি হয়, সবচেয়ে ভাল পারে কোনটা, সবচেয়ে খারাপ লাগে কি পড়তে, কতজন বন্ধু আছে তার, তারা কি করে, ছুটির দিনে কি করে সময় কাটায়, এইসব।

বেশ। বলব বাবা, বলব।

দীপু আস্তে আস্তে ডাকল, আম্মা।

আম্মা বললেন, কি?

কথা বলতে বলতে আর হাঁটতে হাঁটতে আম্মা ওকে নিয়ে এলেন একটা ভারি সুন্দর রেষ্টুরেন্টে। ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারল চাইনীজ রেষ্টুরেন্ট, ও খালি নাম শুনেছে কখনো দেখে নি। ভেতরে অন্ধকার, অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে দেখা যায় কি সুন্দর চারদিকে। তার মাঝে খুব হালকা বাজনা শোনা যাচ্ছে, কি ভালো লাগে শুনতে। চারদিকে টেবিলে লোকজন বসে আছে খুব সুন্দর জামা কাপড় পরে আর কথা বলছে খুব আস্তে আস্তে। দীপুর এত ভাল লাগল যে বলার নয়। আম্মা ওকে নিয়ে বসলেন একটা টেবিলে। খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, দীপু, বাবা, তুমি সত্যি আমার উপর রাগ করোনি?

না।

তাহলে একবারও আমাকে আম্মা বলে ডাকনি কেন?

দীপু ঠিক এই জিনিসটাই ভাবছিল, একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলল, আমার লজ্জা লাগছে। আগে কখনো তো দেখা হয়নি, তাই—

আম্মা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, মায়ের কাছে লজ্জা কি? বলো একবার বলো—

দীপু বলল, তুমি আমাকে তুমি তুমি করে বলছ কেন? আব্বার মত তুই তুই করে বললেই পার।

আর দীপু হু হু করে কেঁদে উঠে হঠাৎ আম্মাকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় বলল, তুমি আর আব্বা ঝগড়া করলে কেন? কেন?

আম্মা কি বলবেন? শুকনো ক্লান্ত মুখে বসে রইলেন দীপুকে ধরে।

দীপুকে আম্মা এতসব জিনিস খাওয়ালেন যে খাওয়ার পর দীপু উঠতেই পারছিল না। আর কি মজার মজার সব খাবার, এত ভাল আইসক্রীম আগে কখনো খায়নি শুনে আম্মার খুব দুঃখ হল। এটা এমন কিছু ভাল আইসক্রীম নয়। এই ঢাকা শহরেই নিজে এর থেকে অনেক ভাল আইসক্রীম খেয়েছেন।

বের হবার সময় আম্মা ম্যানেজারের টেবিল থেকে বেশ কয়েক জায়গায় টেলিফোন করলেন। মেম সাহেবের মত কি টক টক করে ইংরেজি বলেন আম্মা, হাসিটা পর্যন্ত যেন ইংরেজিতে।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বাইরে বের হতেই দীপুর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বাইরে কি রোদ। আম্মা খুব সুন্দর একটা কাল চশমা পরলেন আর তাতে তাকে আরো সুন্দর দেখাতে লাগল। দীপু ছেলেমানুষের মত ওর আম্মার হাত ধরে রাখল যেন ছেড়ে দিলেই হাতছাড়া হয়ে যাবেন।

হঠাৎ আম্মার যেন কি মনে পড়ে গেল, অমনি ব্যস্ত হয়ে গাড়ির কাছে চলে এলেন। দীপু জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে, আম্মা?

তোর ছবি তুলব। আর —



ছবি তোলার কথা শুনেই ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে. ওর সবসময় ছবি তুলতে খুব ভাল লাগে। আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছবি তুলতে ভাল লাগে?

হ্যাঁ, খুব। কিন্তু একটা জিনিস —

কি?

ছবি প্রিন্ট করে আসতে এত দেরি হয় যে বিরক্তি লেগে যায়।

দীপুর কথা শুনে আম্মা মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, সত্যি খুব বিরক্ত লেগে যায়?

হ্যাঁ। আমার দেরি সহ্য হয় না।

আম্মা একটা ক্যামেরা বের করলেন। কি অদ্ভুত ক্যামেরা, দেখে দীপু অবাক হয়ে যায়। ওরকম কেন দেখতে ক্যামেরাটা?

আম্মা উত্তর না দিয়ে বললেন, তুই ওখানে দাঁড়া গাড়িটার পাশে। দীপু দাঁড়াল। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে ওর লজ্জা লাগছিল, কিন্তু উপায় কি? আম্মা ক্যামেরায় চোখ দিয়ে বললেন, ওকি? মুখ অমন করে রেখেছিস কেন? পেট কামড়াচ্ছে নাকি?

শুনে দীপু ফ্যাক করে হেসে ফেলল, সাথে সাথে আম্মা ছবি তুলে নিলেন। ক্যামেরাটা তুলে ধরে আম্মা বললেন, এখন একটা মজা দেখবি?

কি মজা?

আম্মা ওকে হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বললেন, এই সেকেন্ডের কাঁটাটা যখন এখানে আসবে তখন দেখিস।

দীপু বোকা বনে দাঁড়িয়ে রইল। আর কি আশ্চর্য যখন ঘড়ির কাঁটাটা ওখানে এসে গেল তক্ষুণি ঘটাং করে ক্যামেরার ভেতর থেকে কি একটা বেরিয়ে পড়ল। আম্মা উপর থেকে একটা পাতলা কাগজ সরিয়ে নিতেই ও অবাক হয়ে দেখে ওর রঙিন একটা ছবি। সব কয়টা দাঁত বের করে কি হাসিটাই না হাসছে। দীপু আরেকটু হলেই চিৎকার করে উঠত। কোনমতে বলল, কিভাবে হল? কিভাবে হল এটা?

এটাকে বলে পোলারয়েড ক্যামেরা, ফটো তোলার দশ সেকেন্ডের ভেতর ছবি বেরিয়ে আসে।

সত্যি?

দেখলিই তো নিজে।

কি কাণ্ড।

নিবি এই ক্যামেরাটা?

দীপুর দম বন্ধ হবে আসতে চায় উত্তেজনায়। এই রকম একটা জিনিস আম্মা তাকে দিয়ে দিতে চাইছেন।

ছবি তুলে তোর বন্ধুদের অবাক করে দিবি। নিবি?

দীপু মাথা নেড়ে বলল, নেব।

দীপু ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে দেখে। কি হালকা। দেখতে মোটেই ক্যামেরার মত না। অথচ এক মিনিটে রঙিন ছবি বেরিয়ে আসে।

আম্মা বললেন, এই ক্যামেরার অসুবিধে কি জানিস?

কি?

ঢাকায় এর ফিল্ম পাওয়া যায় না। আমার কাছে আর অল্প কয়টা আছে, আয় তোকে শিখিয়ে দিই কিভাবে ফিল্ম ঢোকাতে হয়। আম্মা ওকে দেখানোর জন্যে আরেকটা ফিল্ম ঢোকালেন। দীপু বলল, এবার আমি তোমার একটা ছবি তুলে দিই।

আম্মা হেসে বললেন, আমার ছবি তুলবি? তোল। দীপু ক্যামেরায় চোখ লাগাতেই আম্মা বললেন, দাঁড়া। আয় আমি আর তুই দুজনের ছবি তুলি। কাউকে বলি তুলে দিতে।

একটা ছেলে হেঁটে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, দেখে মনে হয় কলেজে পড়ে। আম্মা ওকে বললেন, তুমি আমাদের দুজনের একটা ছবি তুলে দেবে?

ছেলেটা কৌতূহলী হয়ে বলল, পোলারয়েড ক্যামেরা?

আম্মা বললেন, হ্যাঁ।

আগে দেখিনি কখনো আমি, খালি নাম শুনেছি। এক্ষুনি ছবি বেরিয়ে আসবে না? কি মজা।

ছেলেটা ছবি তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছবিটি দেখার জন্যে। যখন ছবিটি বেরিয়ে এল একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি সুন্দর রঙিন ছবি! বাসায় গিয়ে নিশ্চয়ই কত গল্প করবে, দীপু বুঝতে পারে।

আম্মা ওকে গাড়িতে চড়িয়ে সারা ঢাকা ঘুরিয়ে বেড়ালেন। একটু পরে পরে এক জায়গায় থেমে আরেকটি ক্যামেরা দিয়ে ওর ছবি নিলেন। এগুলো প্রিন্ট করতে হয়। তাই আমেরিকা পৌঁছে ওকে প্রিন্ট করে পাঠাবেন। আজ একদিনে ওর যত ছবি তুললেন দীপু সারাজীবনেও এত ছবি তোলেনি।

আম্মা ওকে নিয়ে গেলেন চিড়িয়াখানায়। হেঁটে হেঁটে বাঘ ভালুক দেখে দেখে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আম্মা তখন ওকে নিয়ে ঘাসের উপর বসে গেলেন। একটা বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে চিনে বাদাম কিনে নিলেন। তারপর বসে বসে দীপুকে খোসা ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন, দীপু যেন নিজে খোসা ছাড়াতে পারে না!

দীপুর হঠাৎ মনে পড়ল ওর আম্মার আজ চলে যাবার কথা। জিজ্ঞেস করল, আম্মা তোমার প্লেন ছাড়বে কখন?

রাত আটটায়।

তোমার দেরি হয়ে যাবে না?

না। তোর সাথে আবার কবে দেখা হবে! খানিকক্ষণ থেকে যাই তোর সাথে, তুই যাবি কেমন করে?

ট্রেনে করে। টিকেট কিনে এনেছি।

কখন ট্রেন?

সাড়ে পাঁচটার সময়। এখন কয়টা বাজে?

সাড়ে তিনটা। ইশ। আর মাত্র দুই ঘন্টা। আম্মা ওর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন, দেখে দীপুর একেবারে কান্না পেয়ে গেল।

রাতে ঘুমাবি কেমন করে?

ট্রেনে আমি ঘুমাতে পারি। আর একরাত না ঘুমালে আমার কিছু হয় না।

আম্মা মাথা নেড়ে বললেন, জানতাম তুই এরকম হবি।

কি রকম?

শক্ত সমর্থ। রেসপন্সিবল। তোর আব্বা তোর জন্মের পর সবসময় বলত, ছেলেকে এমন করে বানাবো যেন সব কিছু করতে পারে। আম্মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, রুমী আর লীরা হয়ে যাচ্ছে অন্য রকম। এখানে এসে থাকতে পারে না, শুধু বলে কবে ফিরে যাব। আমার আর ভাল লাগে না বাইরে থাকতে—

দীপুর ভারি মায়া হল ওর আম্মার জন্যে।

ট্রেন ছাড়ার আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। আম্মা ওর টিকেট বদলে ওকে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কিনে দিয়েছেন। একটা আস্ত বাংক ওর নিজের, ওর ঘুমুতে আর অসুবিধে হবে না। আম্মা বললেন, তোর আব্বা শুনে আমার উপর রাগ করবে না যে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কিনে তোকে বাবু বানিয়ে দিচ্ছি?

না। এক দুদিন চড়লে কিছু হয় না।

হ্যাঁ। তুইই বল, ট্রেনে কষ্ট করে যাবি আর তাহলে আমি শান্তি পাবো? বল?

দীপু মাথা নেড়ে মেনে নিল।

বল, তুই আমাকে চিঠি লিখবি?

লিখব।

বড় বড় চিঠি লিখবি?

বড় বড় চিঠি লিখব।

আর বল তুই শরীরের যত্ন নিবি?

নিব।

বেশি করে দুধ খাবি।

খাব।

আর বেশি করে ফলমূল খাবি।

খাব।

আর বেশি করে পড়াশোনা করবি।

করব।

আর তুই যখন খুব বড় হবি আমি তখন সবাইকে বলবো এই যে বিখ্যাত মুহম্মদ

আমিনুল আলম. এটা আমার ছেলে। ঠিক?

দীপু লজ্জা পেল।

আম্মা ওকে এত এত খাবার কিনে প্যাকেট করে দিয়েছেন। ট্রেনে পড়ার জন্যে চমৎকার সব কমিক কিনে দিয়েছেন। কমিক পড়তে ওর খুব ভাল লাগে, আম্মা কেমন করে সেটা বুঝতে পারলেন।

রাতে ঘুমুতে যেন অসুবিধে না হয় সেজন্যে একটা বালিশ কিনে দিয়েছেন ফুঁ দিয়ে ভেতরে বাতাস ভরিয়ে নেয়া যায় এরকম। একটা কম্বল কিনে দিতে চাইছিলেন, দীপু কিছুতেই কিনতে দেয়নি, এত গরম যে কম্বল মোটেই দরকার পড়বে না।

দীপু ফুটবল খেলতে খুব ভালবাসে শুনে ওকে একটা ফুটবল কিনে দিয়েছেন। এত দামী ফুটবল সে জীবনে দেখেনি পর্যন্ত। বড় বড় লীগের খেলাতেও বোধহয় এগুলো ব্যবহার করা হয় না।

আম্মা অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমার ইচ্ছে করছে তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যাই।

দীপু উত্তর না দিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল।

বল, তোকে আমেরিকা থেকে কি পাঠাবো?

কিছু পাঠাতে হবে না, শুধু তুমি মাঝে মাঝে চিঠি দিও।

কিছু পাঠাবো না?

না, আমার কিছু লাগবে না।

আম্মা একটু হেসে বললেন, বুঝেছি তোর আব্বা তোকে বুঝিয়েছে এমনি এমনি কিছু নিতে হয় না, কষ্ট করে পেতে হয়, ঠিক না?

দীপু মাথা নাড়ল।

কিন্তু আমি তো তোর আম্মা। আম্মা ছেলেদের কিছু কিনে দেবে না?

দীপু চুপ করে রইল।

ঠিক আছে, শুধু তোর জন্মদিনে তোকে উপহার পাঠাবো। কি লাগবে লিখিস। আর যদি না ও লিখিস আমি ভেবে ভেবে কিছু একটা পাঠাবো। আচ্ছা?

তুমি আমার জন্ম তারিখ জানো?

আম্মা শব্দ করে হেসে উঠলেন, আমি তোর মা আর জন্ম তারিখ জানবো না?

দীপু লজ্জা পেয়ে গেল, সত্যিই তো।

ঠিক এ সময় ট্রেন ছাড়ার হুইসল্ পড়ল। আম্মা উঠে দাঁড়ালেন, ওকে ধরে একটু আদর করলেন। ট্রেন নড়ে উঠল। আম্মা তখন ওকে ছেড়ে ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। দীপু জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। আম্মা বাইরে থেকে ওকে ধরে জানালার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলেন আর বাচ্চা মেয়ের মত কাঁদতে লাগলেন। দীপুর ইচ্ছে করছিল ওর আম্মার চোখ মুছিয়ে দেয় কিন্তু ট্রেনের বেগ বেড়ে যাচ্ছে, আম্মা আর সাথে সাথে হাঁটতে পারছিলেন না— ওকে একবার বুকের সাথে চেপে ধরে ছেড়ে দিলেন। আম্মা

দাঁড়িয়ে রইলেন আর ট্রেন ঝিক্‌ঝিক্ ঝিক্‌ঝিক্ করে ওকে দূরে সরিয়ে নিতে লাগল। ও ঝাপসা চোখে দেখতে পেল ওর আম্মা দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তির মত আর আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছেন, আরো ছোট, আরো ছোট . .

ভেতরে ঢুকে দীপু হু হু করে কেঁদে উঠল। সামনে এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, উঠে এসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, ছিঃ খোকা কাঁদছ কেন? আবার তোমার স্কুলে যখন ছুটি হবে তোমার আম্মার সাথে দেখা হবে। এই তো সামনেই ছুটি।

দীপু ভাবল, যদি জানত আর কোনদিনই দীপুর সাথে ওর আম্মার দেখা হবে না।

প্রায় তিন মাস পার হয়ে গেছে। দীপু তার আম্মার সাথে যখন দেখা করতে গিয়েছিল তখন জুন মাস — গরমের সময়। এখন অক্টোবর মাস, আকাশে সাদা সাদা মেঘ ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসে বোঝা যায় শীত আসছে।

দীপুর মা যে আসলে এখনো বেঁচে আছে সেটি দীপু এখনো কাউকে বলেনি। অনেক চিন্তা করে দেখেছে না বলাই ভাল। সবাইকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বলতে ও বিরক্ত হয়ে উঠত শুধু তাই নয় বুঝিয়ে দেবার সময় সবাই এমন করে ওর দিকে তাকাতো যে সেটা ওর মোটেই ভাল লাগত না। দীপু আব্বার সাথে আলাপ করে দেখেছে, আব্বাও বলেছেন তিনি যদি দীপুর জায়গায় হতেন তাহলে তিনিও হয়তো এখন কাউকে কিছু বলতেন না।

দীপু কাউকেই বলেনি কথাটি অবিশ্যি পুরোপুরি সত্যি নয়। সে একজনকে বলেছে, তারিককে। তারিককে না বলে সে পারেনি, তার কারণও ছিল।

একদিন ওর তারিকের বাসায় যাবার দরকার হল। পরদিন ক্লাস নাইনের সাথে ফুটবল খেলা, তারিককে আগে থেকে বলে না দিলে ও হয়তো আসবেই না। আর তারিক যেরকম স্কুল ফাঁকি দেয় এমনও হতে পারে যে স্কুলেই আসবে না সামনের তিন চার দিন। কিন্তু মুশকিল হলো যে দীপু তারিকের বাসা চেনে না। বেশ কজনকে জিজ্ঞেস করে দেখল যে কেউই চেনে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কেউ বলতে পর্যন্ত পারল না ও কোন্ এলাকায় থাকে। সন্তু শুধু বলল হতে পারে ও খালের ওপারে থাকে, কাঠের পুলের ওপর দিয়ে ও কয়দিন তারিককে বই খাতা নিয়ে আসতে দেখেছে।

বাসা খুঁজে বের করতে দীপুর কেমন জানি একটু মজা লাগে। একেবারে কোন কিছু না জেনে সে আগেও বাসা খুঁজে বের করেছে। খুঁজে বের করা যত কঠিন হয়ে ওঠে ওর তত মজা লাগতে থাকে। অবিশ্যি একা একা একটু বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, সাথে অন্য কেউ থাকলে খুব ভাল হয়।

আজ ওর একাই বের হতে হল। সবাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত। এত যে নিষ্কর্মা বাবু তারও নাকি আজ খালার বাসায় বাগানের সব্জী নিয়ে যেতে হবে।

ধোপীর খাল অনেক দূর, তিন মাইলের কম কিছুতেই না। খালের উপরে কাঠের পুল, তার সামনে একটা ছোট দোকান। দীপু সেখানে খোঁজ নিল, ছেলেটি তারিকের

নাম জানে না কিন্তু চিনতে পারল। বলল, এদিকেই কোথায় যেন থাকে। পুলটা পার হয়ে ও আরো কয়েকটা পানের দোকানে খোঁজ নিল, তাদের মাঝে একজন তারিককে চিনতে পারল এমনকি তারিকের আব্বার নাম পর্যন্ত বলে দিল। ওরা সুতার পাড়ায় থাকে, ওর আব্বা একজন কাঠমিস্ত্রী।

এরপরে দীপুর কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবার কথা, পাড়াটার নাম জানে, তারিকের নাম পর্যন্ত জানে। কিন্তু মজার ব্যাপার ও কিছুতেই তবু বাসাটা খুঁজে পেল না। ছোট ছোট গলি দিয়ে ও ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঝিঞ্জি ঝিঞ্জি পাশাপাশি বাড়ি, নোংরা নর্দমা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খালি গায়ে ছোটাছুটি করছে। এর মাঝে কোন্‌টা তারিকের বাসা কে জানে।

দীপু তখন ছোট ছোট ছেলেদের জিজ্ঞেস করতে লাগল, ওরা অনেক সময় বেশি খবর রাখে। প্রায় দশ জনকে জিজ্ঞেস করে ও প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিল, তখন একজন তারিককে চিনতে পারল। বলল, ও। কাচু ভাই? ফাগলি বাড়ির?

কাচু ভাই মানে?

তারিক তো হের স্কুলের নাম। বাড়ি তো হেবে কাচু ডাহে। আহ আমার লগে, ফাগলি বাড়িত থাকে।

দীপু ওর কথা ভাল বুঝতে পারছিল না, পিছে পিছে গেল তবু। ছেলেটি বাঁশের দরমার নড়বড়ে একটা বাসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এই বাড়ি। ফাগলি থাহে এই বাড়িত। ছেলেটা একগাল হেসে চলে গেল।

দীপু ডাকল, তারিক, এই তারিক।

অমনি এক ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেল। ভেতরে মেয়েলি গলার একটা ভীষণ চিৎকার শোনা গেল। তারপর হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা একজন পাগলী বেরিয়ে এল। লাল লম্বা চুল এলোমেলো, হাত পিছনে শক্ত করে বাঁধা, কপালে কাটা, রক্ত পড়ছে দরদর করে।

দীপু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল। দৌড় দেবে কিনা বুঝতে পারছিল না, ঠিক এই সময়ে তারিক বেরিয়ে এল। সামনে দীপুকে দেখে মুহূর্তে ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল। দুই হাতে পাগলীকে ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। ভেতরে চেঁচামেচি গালিগালাজ শোনা গেল কিছুক্ষণ, একটু পরে সব থেমে গেল আর দরজা খুলে তারিক বের হয়ে এলো। সারা মুখ থমথম করছে রাগে। দীপুর কাছে এসে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞেস করল, এখানে এসেছিস কেন?

দীপু উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ও কে?

তোর বাপের কি তাতে?

বল না, কে?

কেউ না।

বল না!

বললাম, তো কেউ না, পাগলী।

তোর মা?

তারিক এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, হ্যাঁ। কেন জানি হঠাৎ তারিকের মুখ কান্না কান্না হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বলল, তুই এখন স্কুলে গিয়ে সবাইকে বলে দিবি আমার মা পাগলি?

শুনে দীপুর এত মন খারাপ হল যে বলার নয়। তারিকের হাত ধরে বলল, তুই আমাকে তাই ভাবিস?

তারিক মাথা নেড়ে বলল, না।

হ্যাঁ, তুই যদি না চাস আমি তাহলে কাউকে বলব না, কোনদিন বলব না।

খোদার কসম?

খোদার কসম।

ওরা দুজন হেঁটে হেঁটে খালের ধারে একটা হিজল গাছের ডালে গিয়ে বসে। তারিক তখন দীপুকে ওর মায়ের কথা খুলে বলল। বছর চারেক আগে টাইফয়েড হয়ে ওর মায়ের মাথার গোলমাল হয়েছে। দিনে দিনে অবস্থা আরো বেশি খারাপ হচ্ছে। এখন প্রায় সব সময়েই বেঁধে রাখতে হয়। ওদের পয়সা নেই বলে চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে পারছে না, ঝাড়ফুঁক আর তাবিজের উপর চলছে। ওর বাবা বেশি খেয়ালও করেন না, মেজাজ খারাপ হলে মারধোর পর্যন্ত করেন। তারিকের যখন অনেক পয়সা হবে তখন সে তার মাকে ভাল করিয়ে আনবে বিদেশ থেকে। ওর মা নাকি খুব আদর করতেন তারিককে, ওর মা ভাল হয়ে থাকলে ও কখনো গুণ্ডা হয়ে যেত না।

দীপুর ভারি মন খারাপ হয়ে গেল শুনে। সেও তখন তারিককে খুলে বলল তার নিজের মায়ের কথা, ওর যে মা থেকেও নেই। শুনে তারিকের চোখে পানি এসে গেল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে ওরা তখন হাত ধরে ঠিক করল দু'জন দুজনের বন্ধু হয়ে থাকবে সারাজীবন। তারিকের সাথে এর আগে কেউ এত ঘনিষ্ঠ হয়ে এত কথা বলেনি, ওর নিজের দুঃখ কষ্টগুলো ভাগ করে নেয়নি। তার দীপুকে এত ভাল লেগে গেল যে বলার নয়। কৃতজ্ঞতায় ওর জন্যে একটা কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। সে আবার দীপুকে নিয়ে বাসায় ফিরে গেল। দীপুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একটু পরে কাগজে জড়ানো কি একটা নিয়ে বের হয়ে এলো। দীপুর হাতে দিয়ে বলল, তুই এটা নে।

কি এটা?

খুলে দ্যাখ।

দীপু খুলে হতবাক হয়ে গেল। ছোট একটা চিতাবাঘের মূর্তি। কুচকুচে কালো পাথরের তৈরি, কি তেজী চিতা, সারা শরীর টান টান হয়ে আছে বাঘের, মনে হচ্ছে এক্ষুণি লাফিয়ে পড়বে কারো উপর।

দীপু চিৎকার করে উঠল, ইশ! কি সুন্দর? কোথায় পেয়েছিস এটা?

ভাল লেগেছে তোর?

লাগেনি মানে! ইশ! কি সুন্দর! আমাকে দিয়ে দিবি?

হুঁ। তুই নে এটা।

কোথায় পেয়েছিস বললি না?

পরে বলব তোকে, আরেকদিন। তারিক রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে।

সেদিন তিন মাইল রাস্তা হেঁটে তারিক দীপুকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

দুপুরে ছুটি হয়ে গেছে সেদিন। তারিক যেন এ জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দীপুকে বলল, চল আমার সাথে।

কোথায়?

কালাচিতা!

কালাচিতা। সেটা আবার কি?

মনে নেই তোর? সেই যে—

ও। দীপুর সেই কালাচিতা বাঘের মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল। লাফিয়ে উঠল সে, নিয়ে যাবি সেখানে?

হুঁ। তারিক মুখ গম্ভীর করে বলল, ভয় পেলে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

অ্যাহ? আমি ভয় পাই? মারব এক ঘুসি।

চল তাহলে।

দুজনে মিলে ওরা রওনা দেয়। তারিকের ধরন ধারণ ভারি অদ্ভুত! বইপত্র রেখে দিল একটা গাছের ফুটোয়। সেখান থেকে বের করল একটা চাকু, একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা ম্যাচ, একটা ছোট মোমবাতি আর একটা তাবিজ। তাবিজটা ও বাঁ হাতে খুব সাবধানে বেঁধে নিল।

তোরও একটা তাবিজ লাগবে। এছাড়া যেতে আসতে পারবিনে।

কিসের তাবিজ?

সাপের।

সাপ? সাপ কোথায়?

যেখানে যাচ্ছি। দেখবি কিলবিল করছে সাপের বাচ্চা। ভয় পাস সাপকে?

নাহ! ভয় না। ঘেন্না লাগে দেখলে। কেমন পিছলা পিছলা, ছিঃ।

তারিক দাঁত বের করে হাসল। তাবিজটা দেখিয়ে বলল, এই যে তাবিজটা দেখছিস এটা কিনেছি কত দিয়ে বল দেখি?

কে জানে?

সোয়া দুই। দশ টাকা চাইছিল।

কোত্থেকে কিনেছিস?

লালু সর্দারের কাছ থেকে। দেখলে তুই ভয় পেয়ে যাবি, এই দাড়ি এই চুল আর

চোখ টকটকে লাল। সাপের খেলা দেখায়। এটা শঙ্খসোনা গাছের শেকড়। অমাবস্যার রাতে শ্মশান ঘাটে ডুব দিয়ে নতুন কাপড় পরে যেতে হয় জঙ্গলে, একটা জ্যান্ত বেড়াল এক কোপে কেটে সেই চাকু নিয়ে খুঁজতে হয়, গাছটা। ভোর রাতের আগে পেয়ে গেলে গাছের শেকড় কেটে আনতে হয়। এই তাবিজ সাথে থাকলে সাপের বাবাও কাছে আসে না।

যা! গুল মারিস না।

বিশ্বাস করলি না তুই? তারিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমি নিজের চোখে দেখেছি লালু সর্দার তাবিজটা সাপের মুখে ধরল আর অমনি সাপ মাথা নিচু করে কি দৌড়টাই না দিল! কি তেজ তাবিজের, সাপ ধারে কাছে আসে না। আমি দুই বছর ধরে পরে আছি একটা সাপও কিছু করল না।

দীপু চুপ করে রইল। ও তাবিজ-টাবিজ বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারিক যেরকম ভাবে বলল অবিশ্বাস করবে কেমন করে?

হাঁটতে হাঁটতে ওরা গ্রামের রাস্তায় এসে পড়ে। কি চমৎকার উঁচু সড়ক। দুপাশে জিওল গাছ। সড়কের দুধারে ধানখেত, কি সুন্দর সোনালী রং। বাতাসে নড়ছে তিরতির করে। বাতাসে কি সুন্দর একটা গন্ধ। অনেক দূরে রেল লাইনের উপর দিয়ে ঝিকঝিক ঝিকঝিক করে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দীপু আগে কখনো এ রাস্তায় আসেনি। ওর এত ভাল লাগছিল যে বলার নয়। তারিককে জিজ্ঞেস করল, তারিক, তোর কালাচিতা কতদূর?

কেন? কাহিল হয়ে গেছিস?

মোটেই না। খুব ভাল লাগছে হাঁটতে, দু পায়ে নরম ধুলা ওড়াতে ওড়াতে বলল, মনে হচ্ছে যতদূর তত ভাল।

ভাল লাগলেই ভাল। এখনো অনেক দূর। আর শোন, লোকজন কই যাচ্ছি কিছু জিজ্ঞেস করলে তুই চুপ করে থাকবি।

কেন?

কালাচিতায় শুধু সাপের আড্ডা তো, লোকজন আমাদের মত ছেড়ো পোলাদের যেতে দিতে চায় না। আমি গুল মারব।

কি রকম জায়গা এটা দেখার খুব আগ্রহ হচ্ছিল দীপুর। তারিক বলল দীপুকে ও প্রথম নিয়ে যাচ্ছে এই জায়গায়। খুব সাপের উপদ্রব বলে কেউ যায় না। যেখানে সাপ থাকে সেখানে সাপের মণি থাকতে পারে ভেবে তারিক প্রথম গিয়েছিল। একটা সাপের মণি হচ্ছে সাত রাজার ধন। একটা কোনভাবে পেয়ে গেলে একেবারে বড়লোক হয়ে যেত। খুঁজে খুঁজে ও সাপের মণি পায়নি ঠিকই কিন্তু অনেক মজার মজার জিনিস পেয়েছে। এই কালাচিতার মূর্তিটা ওখানে পেয়েছিল বলে নাম দিয়েছে কালাচিতা।

জায়গাটা টিলার মত উঁচু, চারদিক জঙ্গলে ভরা, আশেপাশে তিন চার মাইলের ভেতর কোন বসতি নেই। এমন নির্জন যে ভয় লেগে যায়। মনে হয় গাছে একটা পাখি

পর্যন্ত নেই। তারিকের হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যায় জায়গাটা ও হাতের তালুর মত চেনে। ওরা একটু ফাঁকামত জায়গায় এসে হাজির হল। তারিক গম্ভীর হয়ে বলল, এই সে জায়গা।

দীপু অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল, বলল, কোথায়?

হুঁ বাবা, সময় হলেই দেখবি। পকেট থেকে মোমবাতি বের করে দুপুর রোদের মাঝেই সে জ্বালিয়ে নিল। গম্ভীর হয়ে দীপুকে বলল, আমি আগে যাই, আমি নেমে গেলে তুই নামিস।

দীপুকে অবাক করে দিয়ে সে সামনের ঝোপটা সরিয়ে সাবধানে নেমে যেতে লাগল। দীপু অবাক হয়ে দেখল ছোট একটা গর্তের মতন নিচে নেমে গেছে — নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঝোপ দিয়ে ঢাকা বলে বোঝার উপায় নেই।

নিচে নেমে গিয়ে তারিক দীপুকে ডাক দিল। দীপু জিজ্ঞেস করল, কিভাবে নামব?

সাবধানে ইট ধরে ধরে, পা দিয়ে খুঁজে দেখিস ছোট ছোট গর্ত আছে।

দীপুর দেয়াল বেয়ে উঠতে নামতে কখনো কোন অসুবিধে হয় না, কিন্তু অন্ধকারে এভাবে নামতে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেল। তারিক অবিশ্যি ওকে বলে দিচ্ছিল কোথায় পা রাখতে হবে।

অন্তত দশ বারো ফুট নিচে নেমে ও পায়ের নিচে মাটি পেল। অন্ধকার চোখ সয়ে যেতেই ও অবাক হয়ে যায়। ছোট একটা ঘরের মত জায়গা। একপাশে থাক থাক সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তারিক বলল, দেখলি?

হুঁ। কি কাণ্ড। তুই নিজে খুঁজে বের করেছিস এটা?

হ্যাঁ। এটা হচ্ছে একটা ঘর, ঐ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলে আরেকটা ঘর। তবে ওটা মাটি দিয়ে বুজে আছে।

চল যাই।

আয়, সাবধানে আসিস।

ওরা দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যায়। বেশিদূর যেতে পারে না, ভাঙা দেয়াল গাছের শেকড় ও মাটিতে রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে।

চারদিকে এরকম অনেক ঘর আছে, সব মাটিতে বুজে আছে।

কিভাবে জানিস তুই?

আমি উপরে দিয়ে ঘুরে ঘুরে একটা আন্দাজ করেছি। অনেক বড় দালান এটা। আমরা বোধহয় তিন তলায় আছি। নিচে হয়ত আরো দুই তলা আছে।

সত্যি?

হুঁ। কোন না কোন ঘরে নিশ্চয়ই সোনা-রূপা ভরা একটা বাক্স পেয়ে যাব। যদি পেয়ে যাই তাহলে তোর অর্ধেক আমার অর্ধেক।

দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বোঝা যায় তারিক ঠিকই বলছে সত্যি এটা কোন

বড় দালানের একটা অংশ। পুরোটা খুঁড়ে বের করতে পারলে না জানি কত কি বের হয়ে আসবে।

এই দেখ, তারিক ওকে টেনে একপাশে নিয়ে যায়। এগুলো পেয়েছি আমি এখানে।

দীপু খুঁটে খুঁটে দেখে। নানা রকম মূর্তি ছোট বড় নানা আকারের সব কালো কুচকুচে পাথরের। আরো কি সব জিনিস, একটা পুঁতির মালা, মরচে ধরা লোহার টুকরো, মাটির বাসন, পোড়া কাঠ, কয়েক টুকরো হাড়, কে জানে হয়তো মানুষেরই, দীপুর একটু ভয় ভয় লাগে।

তারিক বলল, একা একা এটা খুঁড়ে বের করা মুশকিল, তুই যদি থাকিস আমার সাথে খুব ভাল হবে। থাকবি?

থাকব না মানে! কি দারুণ জিনিস এটা বুঝতে পারছি না? কাল থেকেই শুরু করে দেব।

তারিক চকচকে চোখে বলল, তোর কি মনে হয়, পাওয়া যাবে কোন গুপ্তধন?

কে জানে সেটা, এরকম একটা জায়গা, পাওয়াই তো উচিত।

হুঁ, আছেই এক আধটা, আমার কোন সন্দেহ নেই।

ওদের ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দীপু তারিককে কথা দিল জান থাকতে ও কাউকে কালাচিতার কথা বলবে না, আর একটা তাবিজ কেনার পর ওরা সময় করে করে কালাচিতা খুঁড়তে যাবে। তাবিজ ছাড়া যাওয়া ঠিক না।

বাসায় ফিরে এসে দীপু দেখে আব্বা খুব মনোযোগ দিয়ে ওর কালাচিতাটা দেখছেন। দীপুকে দেখে বললেন, দীপু এটা কোথায় পেয়েছিস?

বলব না।

বল না, দেখে মনে হচ্ছে ভাল জিনিস।

ভাল মানে কি? দামী?

দামী হতেও পারে, কিন্তু বানিয়েছে ভাল। কোথায় পেয়েছিস?

আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়েছে।

সে কোথায় পেয়েছে?

সেটা বলা যাবে না। টপ সিক্রেট। তুমি জিজ্ঞেস করো না।

আব্বা হতাশ হবে হাত ওল্টালেন এবং বললেন, তোর আম্মার চিঠি এসেছে একটা। তোর টেবিলের ওপর আছে।

সত্যি! কি লিখেছে?

খুলিনি আমি, তোর চিঠি তুই খোল।

দীপু চিঠিটা নিয়ে আব্বার কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আব্বা, কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে কি চিকিৎসা করে তাকে ভাল করা যায়?

যায় নিশ্চয়ই। তবে কখনো কখনো আর ভাল হবার মত অবস্থা থাকে না। কেন?

না, সেটাও বলা যাবে না। এটাও টপ সিক্রেট।

কয়টা টপ সিক্রেট তোর?

অনেকগুলো। আচ্ছা আব্বা, পাগলদের চিকিৎসা কোথায় হয়?

মেন্টাল হসপিটালে। পাবনাতে আছে। যাবি চিকিৎসা করাতে?

যাও! আমি কি পাগল নাকি?

না, তুই আধপাগল। চিকিৎসা করালে পুরো পাগল হবি।

দীপু চলে যেতে যেতে আবার ফিরে আসে।

আচ্ছা আব্বা, তুমি তাবিজ বিশ্বাস কর?

না।

একেবারেই কর না?

একেবারেই করি না।

তাবিজ থাকলে সাপে কামড়ায় না এরকম তাবিজ দেখেছ কখনো?

দেখিনি, শুনেছি।

কি শুনেছ?

সাপের মুখের কাছে ধরলে সাপ দৌড়ে পালায়।

দীপুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চোখ বড় বড় করে বলল, তুমি দেখবে সেরকম তাবিজ?

তুই দেখবি?

দীপু বোকা বনে বলল, দেখাও।

আব্বা আস্তে আস্তে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ম্যাচের কাঠিটা নিভিয়ে ওর হাতে দিলেন, এই দেখ।

কি?

সাপের তাবিজ।

কোথায়?

এই যে ম্যাচের কাঠি।

যাও! তুমি শুধু ঠাট্টা কর।

ঠাট্টা না। তুই এটা সাথে রাখ। যখন দেখবি কোন সাপুড়ে সাপের তাবিজ বিক্রি করছে এই কাঠিটা সাপুড়েকে দিয়ে বলিস সাপের মুখের কাছে ধরতে। সাপ যদি দৌড়ে না পালায় তাহলে আমার কাছে আসিস।

কেন? ওরকম হবে কেন?

সাপুড়েরা তাবিজ বিক্রি করার আগে লোহার শিক গরম করে সাপের মুখে ছ্যাঁকা দেয়। এরপরে যখন সাপের মুখের কাছে কিছু ধরে সাপ মনে করে এই বুঝি আবার ছ্যাঁকা দিল, অমনি দৌড়ে পালায়।

তাই? দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কি পাজি সাপুড়েরা।

পাজি হবে কেন। তাবিজ বিক্রি করে সে বেচারারা তাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়। ওটা তাদের ব্যবসা। লোকজনকে বিশ্বাস না করালে তাবিজ বিক্রি করবে কেমন করে?

আর কেউ যদি ওটা বিশ্বাস করে সাপের কামড় খায়?

তা খাবে না। সাপ দেখলেই তাবিজ টাবিজ ভুলে দৌড় দেবে।

তাহলে সাপ থেকে বাঁচার কোন জিনিস নেই?

থাকবে না কেন? কার্বলিক অ্যাসিড। আমি যখন আসামে থাকতাম সাপ কিলবিল করত। একটা বোতলে ভরে মুখ খুলে রাখতাম, সাপ ধারে কাছে আসত না।

কি নাম বললে?

কার্বলিক অ্যাসিড। খুব কড়া বিষ কিন্তু, একটু পেটে গেলে সোজা বেহেশ্‌ত। তোর হঠাৎ দরকার পড়ল কেন? সাপের বিজনেস করবি নাকি?

যাও। ছিঃ।

দীপু নিজের ঘরে গিয়ে কার্বলিক অ্যাসিড শব্দটা লিখে রাখল ভুলে যাবার আগে। তারপর যত্ন করে আম্মার চিঠিটা খুলে পড়তে বসল।

কালাচিতায় কিভাবে খুঁড়োখুঁড়ি শুরু করবে দীপু আর তারিক এই নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করল। তারিককে দীপু কিছুতেই বোঝাতে পারল না সাপের তাবিজটা আসলে একটা ভাঁওতাবাজী। তারিক ডাক্তারের দোকানে ঘুরে ঘুরে কার্বলিক অ্যাসিড কিনে আনল ঠিকই কিন্তু তাবিজটা ছাড়তে রাজি হল না। খোঁড়াখুঁড়ি করার জন্যে শাবল কোদাল মাটির টুকরি জোগাড় করে সাবধানে কালাচিতায় নিয়ে যাওয়া হল। দুজনে মিলে পুরো কালাচিতাটা সাবধানে ঘুরে ঘুরে একটা ম্যাপ তৈরি করল। যত্ন করে খোঁজাখুঁজি করে ওরা আরো মজার মজার জায়গা খুঁজে পেল। ছোট ছোট কুঠুরী কিছু কিছু আবার সুড়ঙ্গ দিয়ে একটার সাথে আরেকটার যোগাযোগ। কোথাও কোথাও মাটি ধ্বসে পড়ে সব বন্ধ হয়ে আছে। সব খুঁড়ে ফেলতে পারলে কত মজার জিনিস যে বের হবে কে জানে! উত্তেজনায় ওরা টগবগ করতে থাকে।

মাটি খোঁড়াটা কিন্তু সেরকম হয়ে উঠছে না। রাতে দীপুর পক্ষে যাওয়াটা সম্ভব না। আব্বাকে সব খুলে বললে আব্বা হয়তো আপত্তি করবেন না কিন্তু এটা এখন আব্বাকে বলা সম্ভব না। আর আব্বাকে না বলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এখন শুধু স্কুল ছুটির পরে যায়। বন্ধুবান্ধব সবাইকে ধোঁকা দিয়ে কালাচিতায় যাওয়া খুব কঠিন। কোন কোনদিন ওরা যেতে পর্যন্ত পারে না। সবার সাথে ফুটবল খেলতে হয়। কয়দিন পরে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে তখন সারাদিন কালাচিতায় থেকে কাজ করতে পারবে। সেই আশাতেই আছে।

এর মাঝে হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার হল। কালাচিতায় কাজটাজ করে দীপু বাসায় ফিরে এসে দেখে ওর আব্বার এক বন্ধু অপেক্ষা করে বসে আছেন।

হাত মুখ ধুয়ে আসার আগেই আব্বা তাকে ধরে নিয়ে গেলেন তার বন্ধুর কাছে।

বললেন, জামশেদ এই হচ্ছে আমার ছেলে দীপু। আর দীপু এ হচ্ছে তোর জামশেদ চাচা।

জামশেদ নামের ভদ্রলোকটির বয়স ওর আব্বার থেকে বেশি হতে পারে। কানের পাশে চুল পেকে গেছে। মোটাসোটা ভদ্রলোক। দীপু অবাক হয়ে দেখল ভদ্রলোকের হাতে তার কালাচিতাটা। ভদ্রলোকের চোখ চকচক করছিল, দীপুকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?

আমার একজন বন্ধু আমাকে দিয়েছে।

সে এটা কোথায় পেয়েছে?

দীপু একটু অস্বস্তি নিয়ে বলল, সেটা আমি বলতে পারব না।

ভদ্রলোক ভারি অবাক হয়ে বললেন, কেন?

আমার বন্ধুকে আমি কথা দিয়েছি আমি কাউকে বলব না।

ভদ্রলোকের বুঝতেই যেন খানিক সময় লাগল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, তুমি জান এটা কি জিনিস?

চিতা বাঘ।

এটার দাম জান?

দীপু চমকে উঠে বলল, কত?

টাকা দিয়ে এর দাম হয় না। এই এলাকায় মৌর্য সভ্যতার একটা চিহ্ন পাওয়া যাবার কথা। অনেকদিন থেকেই আমরা এটা খোঁজাখুঁজি করছি। তোমার এই চিতাবাঘটা হচ্ছে মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ে তৈরি একটা ভাস্কর্য। কাজেই এটা যদি এই এলাকায় পাওয়া গিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে কাছাকাছি এই সভ্যতার চিহ্ন আছে।

দীপুর দম বন্ধ হয়ে আসে উত্তেজনায়। তাদের কালাচিতাই তাহলে সেই জায়গা। কিন্তু সে তো কিছুতেই বলবে না জামশেদ সাহেবকে। তারিক খুঁজে বের করেছে জায়গাটা। তারিককে জিজ্ঞেস না করে সে কিছু বলতে পারবে না।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এবার বুঝতে পেরেছ কেন এই চিতাবাঘ কোথায় পাওয়া গেছে এটা জানতে চাইছি?

দীপু মাথা নাড়ল। তারপর বলল, কিন্তু আমি এখন সেটা বলতে পারব না।

তুমি জায়গাটা চেনো?

হ্যাঁ, চিনি।

তাহলে চল আমার সাথে, নিয়ে চল সেখানে।

দীপু ওর আব্বার দিকে তাকাল। আব্বা অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন, কাজেই সে আবার ঘুরে তাকাল জামশেদ সাহেবের দিকে। বলল, চাচা, আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এখন আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না।

কেন? ভদ্রলোক এবারে যেন রেগে উঠলেন।

আমি আমার বন্ধুকে কথা দিয়েছি ওটা কাউকে বলব না। ওকে জিজ্ঞেস না করে

আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না।

দীপু বুঝতে পারল ভদ্রলোক রেগে উঠেছেন। এখানে রেগে ওঠার কি আছে সে বুঝতে পারছিল না। জামশেদ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোমার বন্ধুর বাসা কোথায়? ওর বাসায় টেলিফোন আছে?

না, ওদের টেলিফোন নেই। বাসা অনেক দূরে, ধোপীর খালের ওধারে, সুতার পাড়ায়।

ওর আব্বার নাম কি, কি করেন?

আব্বার নামটা ভুলে গেছি। কাঠমিস্ত্রীর কাজ করেন।

হোয়াট? কাঠমিস্ত্রী?

ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে গেলেন তারপর ওর আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললেন, হাসান, তোমার ছেলে কি রকম মানুষের সাথে ঘুরোঘুরি করছে খবর রাখ না?

ওর আব্বা বললেন, জামশেদ আমি পরে এটা নিয়ে তোমার সাথে আলাপ করব।

ভদ্রলোক খুব বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, দীপুকে প্রায় ধমকে উঠে বললেন, তোমার ঐ বন্ধুকে পরে বলে দিলেই হবে। এখন আমার সাথে চল।

দীপু খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, না।

হোয়াট?

আপনি আমার উপর রাগ করছেন কেন? আমি তো বলেছি আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস না করে আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না।

ভদ্রলোক ভীষণ রেগে দীপুর আব্বার দিকে তাকালেন, তারপর ইংরেজিতে বললেন, ছেলেটিকে তুমি ভদ্রতা শেখাওনি মনে হচ্ছে।

দীপুর এবারে খুব রাগ হয়ে গেল। বড়দের সাথে ও কখনো অভদ্রতা করে না কিন্তু তাই বলে সে এবারে চুপ করে থাকল না। আস্তে আস্তে বলল, চাচা আমি অল্প অল্প ইংরেজি বুঝতে পারি। আমি যদি আপনার সাথে অভদ্রতা করে থাকি তাহলে তার জন্যে মাফ চাইছি। তারপর একটু থেমে যোগ করল, কিন্তু তবুও আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস না করে আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না।

ভদ্রলোক রাগে থমথম করতে লাগলেন। আব্বা দীপুকে বললেন, দীপু তুই যা এখন, হাত মুখ ধুয়ে মানুষ হ।

দীপু বেরিয়ে যেতেই আব্বা বললেন, জামশেদ, আমার মনে হয় তুমি ঐ কথাটি না বললে ভাল করতে।

কোন্ কথাটি?

কার ছেলের সাথে ঘুরোঘুরি করছে খবর রাখি কি না।

কেন? আজেবাজে লোকের বদছেলের সাথে ঘুরোঘুরি করছে আর তুমি—

আস্তে জামশেদ, আমি চাই না দীপু এসব কথা শুনুক।

কেন?

তার ভাল লাগবে না। আমি ওকে আমার মনের মত করে মানুষ করতে চাই।

কোনটা তোমার মনের মত? বদ ছেলেপিলের —

আস্তে জামশেদ। আমার ক্ষমতা ছিল দীপুকে ঢাকায় কিংবা বাইরে খুব ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে মানুষ করার। খুব স্মার্ট হয়ে বড় হত তাহলে, ইংরেজিতে খাঁটি ব্রিটিশ টান থাকত, আর দশটা বড়লোকের ছেলের মত কমিক পড়ে টিভি দেখে মানুষ হত। হয়তো খুব ভদ্র হতেও পারত— রাস্তার একটা ছেলের সাথে হয়তো বেশ ফ্রেন্ডলী হতে পারত, কিন্তু সব বাইরে থেকে। ভেতরে ভেতরে কোনদিন ওদেরকে নিজের মানুষ বলে মনে হত না। ওর ক্লাসের যে ছেলেটা পয়সার অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আইসক্রীম বিক্রি করতে চলে গেছে ওর জন্যে ভেউভেউ করে কাঁদতে পারত না! আমি চাই আমার ছেলে খুব সাধারণ একটা ছেলে হোক, কাঠমিস্ত্রীর ছেলের সাথে ঘুরেঘুরে নিজেকে চিনুক। রাস্তায় মার খেয়ে ফিরে আসুক, আরেকদিন পাল্টা মার দিয়ে নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস হোক। দুধ মাখন খেয়ে খেয়ে শো কেসের পুতুল যেন না হয়।

জামশেদ সাহেব চুপ করে বসে থাকলেন। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, ওসব বড় কথা ছেড়ে দাও হাসান। মা নেই বলে এরকম হয়েছে। কোথায় তুমি—

আব্বা হাত নেড়ে বললেন, ওসব ছেড়ে দাও। আমার ছেলেকে আমি ঠিক আমার মনের মত করে মানুষ করব। যেটা ভাল বোঝে সেটা করবে তাতে দুনিয়া রসাতলে যায় যাক—

জামশেদ সাহেব একটু রেগে উঠলেন, যদি আমার ছেলে হতো আমি পিটিয়ে সিধে করে দিতাম। কোথায় পেয়েছে চিতাবাঘটা জানতে চেয়েছিলাম, বললই না। অথচ চিন্তা কর কত ইম্পর্ট্যান্ট।

আব্বা হেসে বললেন, কালকের দিনটা থেকে যাও, দীপু তার বন্ধুর সাথে কথা বলে যদি দেখাতে চায় দেখিয়ে দেবে।

হুঁ, আমি প্লেনের টিকেট ক্যানসেল করে থেকে গেলাম আর তোমার ছেলে বলল, দেখানো যাবে না। তখন?

হুঁ, তা বটে। আব্বা একটু হেসে বললেন, তোমরা এত বড় বড় সব আর্কিওলজিস্ট তোমরা কেন বাচ্চা ছেলেদের উৎপাত করে বেড়াচ্ছ? নিজেরা খুঁজে বের করে ফেল না।

দীপু পাশের ঘর থেকে শুনল জামশেদ সাহেব রেগেমেগে ইংরেজিতে কি বলছেন আর দীপুর আব্বা হো হো করে হাসছেন।

দীপু তারিককে সব খুলে বলেছে। সব শুনে তারিক একটু ঘাবড়ে গেল। ওরা গুপ্তধন বের করে ফেলার আগেই যদি বড় বড় লোকেরা তাদের কালাচিতা নিয়ে নেয়

তাহলে তো খুব দুঃখের কথা হবে। আবার এও সত্যি কথা যে জায়গাটা যদি সত্যিই এত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তো ওদের জানিয়ে দেয়াই উচিত। কি করতে হবে বুঝতে না পেরে দুজনেই খুব ছটফট করছিল।

সারাদিন ক্লাস করে বিকেলে স্কুল ছুটির পর ক্লাস থেকে বের হতেই ক্লাসের গোটা দশেক ছেলে ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ছেলেদের ভেতর থেকে বাবু একটু গম্ভীর গলায় বলল, তোর সাথে কথা আছে।

কি নিয়ে কথা হতে পারে দীপু বুঝে গেল সাথে সাথে। তবু চোখেমুখে একটু কৌতূহল ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি কথা?

আমরা সবাই জানতে চাই তুই প্রত্যেকদিন বিকেলে তারিকের সাথে কোথায় যাস।

দীপু বুঝতে পারল ধরা পড়ে গেছে। ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, এখন সেটা বলতে পারব না।

কেন পারবি না? আমরা তোর বন্ধু না?

বন্ধু হবি না কেন?

তাহলে আমাদের বিশ্বাস করিস না?

বাজে কথা বলিস না, বিশ্বাস করব না কেন?

তাহলে বল, কোথায় যাস তোরা?

মঞ্জু চোখ ছোট ছোট করে বলল, আমি তোদের পিছু পিছু গিয়েছিলাম একদিন, দেখেছিও কোনদিকে যাচ্ছিস।

দীপু মঞ্জুর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে যে সত্যি কথাই বলছে।

মিঠু গোঁয়ারের মত বলল, ঐ জঙ্গলের ভেতর কি করতে যাস বলতে হবে।

যদি আমাদের না বলিস, তোর সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই। তুই থাক তারিককে নিয়ে।

দীপু বলল, ঠিক আছে তোদের আমি বলব, কিন্তু তার আগে আমাকে তারিকের সাথে কথা বলে নিতে হবে।

ঠিক আছে, বলে নে, ঐ যে তারিক আসছে।

দেখা গেল তারিক উদ্বিগ্ন মুখে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। বলল, কি হয়েছে রে?

দীপু তারিককে ডেকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

কি হয়েছে দীপু?

ক্লাসের সবাই জেনে গেছে কালাচিতার কথা।

সর্বনাশ! তাহলে?

ওদের বলে দিতে হবে। আসলে ভালই হবে, তাহলে সবাই মাটি কাটতে সাহায্য করতে পারবে, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারব, আর আমাদের তো ব্যাপারটা জানাতেই হবে, আগে হোক পরে হোক।

তারিক চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু যদি এখনই জানাজানি হয়ে যায়? সবাই তাহলে খ্যাচম্যাচ শুরু করবে।

জানাজানি হবে না।

তুই কিভাবে জানিস? সবাই কি তোর মত? কারো পেটে কথা থাকবে না।

সেটা তুই আমার উপরে ছেড়ে দে। কারো পেট থেকে যেন কথা বের না হয় সেটা আমি দেখব।

তারিক তবু উসখুস করতে থাকে। কি জন্যে সেটা দীপুর বুঝতে বাকি থাকে না। তারিককে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলল, আর শোন, যদি কোন গুপ্তধন পাওয়া যায়, সেটা তোরই থাকবে। আমি আগে সবাইকে বলে দেব।

তারিক একটু লজ্জা পেয়ে বলল, ধেৎ। গুপ্তধন কি আর সত্যি আছে?

যদি থাকে?

যদি থাকে তাহলে সবাই না হয় ভাগাভাগি করে নেব।

ঠিক আছে তুই অর্ধেকটা নিবি, আমরা বাকি সবাই বাকী অর্ধেকটা ভাগ করে নেব।

তারিক খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল। একা একা মাটি কাটা আর ওর সহ্য হচ্ছিল না।

দীপুর জন্যে সবাই দাঁড়িয়ে ছিল মাঠের পাশে। দীপু এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, তোদের আমি সব বলব।

সবাই খুশি হয়ে উঠল। বাবু বলল, বল।

কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত।

আজ রাত একটার সময় এখানে আসতে হবে।

রাত একটায়? এখানে? কি জন্যে?

শোনার জন্যে। আমি রাত একটার সময় বলব। যারা যারা শুনতে চাস, রাত একটার সময় আসিস। যারা যারা রাত একটার সময় আসবে তাদের আমরা দলে নিয়ে নেব।

রাত একটার সময় কেন? এখনই বল, এখনই দলে নিয়ে নে।

উহু! ব্যাপারটা একেবারে টপ সিক্রেট, শুনলেই বুঝতে পারবি। যারা রাত একটার সময় কষ্ট করে আসবে বুঝতে পারব শুধু তাদেরই খাঁটি ইচ্ছে আছে, তাদের বললে তারাও গোপন রাখবে পুরো ব্যাপারটা। শুধু তাদেরই বলা যাবে।

কিন্তু—

কোন কিন্তু না। দীপু মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে রইল, এত গম্ভীর যে দেখে তারিক পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

রাতে খাবার সময় দীপু তার আব্বাকে বলল, আব্বা আজ রাতে আমাকে একটু

বের হতে হবে।

কত রাতে?

সাড়ে বারোটার দিকে।

আম্মা অবাক হয়ে তাকালেন, এত রাতে কি করবি?

দীপু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, একটা কাজ ছিল।

চুরি করতে যাবি কোথাও?

যাও! দীপু একটু ইতস্তত: করে বলেই ফেলল, সেই চিত্রাবাবের ব্যাপারটা। এখন আমরা আরো কয়েকজনকে দলে নেব তাই সবাইকে বলেছি রাত একটায় আসতে। যারা আসতে পারবে বোঝা যাবে তারা সত্যি সত্যি আমাদের সাথে আসতে চায় সবাইকে বলে দেবে না।

হুঁ। আম্মা একটু হেসে বললেন, বাবোরা ছেলেগুলোকে তাদের আব্বাদের দিয়ে পিটুনি খাওয়াবি?

কেন?

বাহ্। রাত একটার সময় ছেলে যদি ঘর থেকে বের হয় তাহলে আব্বারা ছেড়ে দেবে? এমনিতে হয়তো ওরা তোদের সিক্রেট বলে দিত না, কিন্তু কাল সকালে পিটুনি খেয়ে ঠিকই বলে দেবে।

দীপু চিন্তিত হয়ে উঠল, সে এদিকটা ভেবে দেখেনি। সত্যি সত্যি এটা হতে পারে, তাহলে সব্বোনাশ হয়ে যাবে। দুর্বল গলায় বলল, আম্মা।

কি?

কি করা যায় তাহলে?

আমি কি জানি! তোদের ঝামেলা তোরা মেটাবি।

বল না কি করি।

উঁহু। আম্মা খাওয়ায় মন দিলেন। দীপু আম্মাকে চেনে, এর ব্যাপারে কখনো কিছু বলেন না, নিজের ঝামেলা মেটাতে হয় ওর নিজেকে।

তোরা কি কোন সভ্যতা-টভ্যতা খুঁজে পেয়েছিস? কয়দিন থেকে যেরকম মাটি মেখে ফিরে আসিস মনে হয় খোঁড়াখুঁড়ি পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে।

আর কয়দিন আম্মা, তারপরে বলে দেব সবাইকে। এখন জিজ্ঞেস করো না।

ঠিক আছে। আমি শুধু বলছিলাম যে এসব জায়গা খোঁড়া কিন্তু খুব কঠিন। যারা এক্সপার্ট তারা যদি না থাকে সব নষ্ট হয়ে যায়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আর বড় কথা যে যদি কোন রকম মূর্তি-টুর্তি পাওয়া যায় তাহলে খুব সাবধান!

কেন?

একটু চোট লেগে ভেঙে যদি যায় খুব খারাপ হবে সেটা। আর যদি স্মাগলারেরা

খোঁজ পায় তাহলেই হয়েছে!

কেন, কেন?

এদেশে এসব জিনিস বেচাকেনা করা যায় না, কিন্তু কোনভাবে যদি দেশের বাইরে নিতে পারে তাহলে হাজার হাজার টাকায় বিক্রি হয়। তাই স্মাগলাররা সবসময় ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়ায়। পড়িসনি খবরের কাগজে মিউজিয়াম থেকে মূর্তি চুরি হয় রোজ?

দীপু জানত না এত সব কিছু হতে পারে তাদের কালাচিতায়। ও ঠিক করল পরের বার জামশেদ চাচা আসা মাত্র তাকে বলে দেবে কালাচিতার কথা।

রাত সাড়ে বারোটার সময় দীপু ঘুম চোখে বের হল। আব্বাকে বলে ঘরের চাবিটা নিয়ে নিল। রাতে ফিরে এসে যেন আব্বাকে ডাকাডাকি করতে না হয় দরজা খুলে দেবার জন্যে।

এত রাতে একা একা যেতে ওর ভয় ভয় করছিল। কিসের ভয় এটা কে জানে! ও খুব ভাল করে জানে ভূত বলে কিছু নেই। আর শহরের উপর তো বাঘ-ভালুক আসতে পারে না, তাহলে ওর ভয়টা কিসের? নিজেকে সাহস দিয়ে ও রাস্তার একপাশ দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে চলল।

স্কুলের মাঠটা নির্জন। গেট বন্ধ বলে ওকে দেয়াল টপকে ঢুকতে হল। যেখানে এসে ওদের দেখা করার কথা সেখানে গিয়ে দেখতে পেল একটু ছায়া জমাট বেঁধে আছে। সিগারেটের আগুন জ্বলছে নিভছে দেখে বুঝতে পারল ওটি তারিক। দীপুর বুকে তখন সাহস ফিরে এল।

তারিক চুপচাপ পা ঝুলিয়ে বসে আছে দেয়ালে। দীপুকে দেখে বলল একা একা বসে থেকে বিরক্ত হয়ে গেলাম এতক্ষণে আসলেন লাট সাহেব।

একটার সময় না আসার কথা। এখনো তো একটা বাজেনি। তুই কখন এসেছিস?

বারটা থেকে বসে আছি।

এত আগে এসেছিস?

সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে আসলাম। এত রাতে আর বাসায় গিয়ে কি করব?

কি সিনেমা দেখলি?

অবুঝ হৃদয়। কি একটা বই, আহা! লাস্ট সিনে চোখে একেবারে পানি এসে যায়।

দীপু জানে তারিক সিনেমার এক নাম্বার ভক্ত। আর সব সিনেমাতেই সব শেষে যখন সবার মিল হয়ে যায় তখন তারিকের চোখে পানি এসে যায়।

কেউ আসবে বলে তোর মনে হয়?

তারিক ঠোঁট উল্টিয়ে বলল কে জানে? না আসলে নাই।

ঠিক এই সময়ে দেখা গেল গুটি-গুটি কে যেন আসছে। কাছে আসতেই বোঝা গেল বাবু। একটু কাঁপছে শীতে।

আস্তে আস্তে বলল, তোরা আছিস তাহলে? আমি ভাবলাম গুলপট্টি মেরেছিস নাকি কে জানে?

গুলপট্টি মারব কেন! আসতে অসুবিধে হয়েছে নাকি?

হয়নি আবার। আম্মাকে বলেছি খালা যেতে বলেছে, রাতে না আসলে বুঝবেন খালা আটকে রেখেছে। খালার বাসায় গিয়ে বলেছি রাতে ফিরে যেতেই হবে! এখন ধরা না পড়লে হয়।

ধরা পড়লে আর কি, মার খাবি আর কি একটু!

এই সময়ে দেখা গেল আরো দুজন গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই দেখা গেল দীলু আর মঞ্জু।

তোরা আছিস তাহলে! আর কেউ আসেনি?

এই তো বাবু এসেছে! অসুবিধে হয়নি?

নাহ! আমি আম্মাকে বলেছি দীলুর বাসায় থাকব, দীলু বলেছে আমার বাসায় থাকবে। অংক করব রাতে।

গুড। এই তো বুদ্ধি।

ঠিক এই সময়ে শেয়ালের ডাক শোনা গেল। এক সেকেন্ডের জন্যে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সবাই তার পরেই বুঝতে পারল ওটা মিঠু। এত সুন্দর শেয়ালের ডাক দিতে পারে যে আসল শেয়াল লজ্জা পেয়ে যাবে। ক্লাসে যখনই কিছু দেখাতে হয় ওদের ক্লাস থেকে মিঠু শেয়ালের ডাক দিয়ে শোনায়। ছোট ক্লাসের ছেলেরা ওকে দেখলে চেঁচিয়ে গান গায়ঃ

'শেয়াল রে শেয়াল
এটা কি খেয়াল!'

মিঠু আসার পর সবার ভেতর একটু স্ফূর্তির ভাব এসে গেল। ধরা পড়লে কি বলা হবে সেটা তৈরি করে নেয়া হল। মিঠুর বুদ্ধি, বলা হবে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল।

বাবু বলল, কি? ভেবেছিস যাত্রা দেখতে গিয়েছি বললে আব্বা কোলে নিয়ে আদর করবেন?

না, তা অবিশ্যি ঠিক। দীপু বলল, তবু সত্যি কথাটা না বললি আরকি। পরে যখন সব জানাজানি হবে তখন বললেই হবে।

সত্যি কথাটি কি বল এবার।

দাঁড়া, দেখি আর কেউ আসে নাকি।

শেষ পর্যন্ত প্রায় দশ জনের মত এসে গেল। দীপু এতটা আশা করেনি। সবাই গোল হয়ে বসল মাঠে। দীপু তারিককে খোঁচা দিয়ে বলল, তারিক বল তোর কালাচিতার ঘটনা—

তারিক বলল, আমি কি বলব তুইই বল।

দীপু ওদের বলতে থাকে গোড়া থেকে। কিভাবে কালাচিতা আবিষ্কার করল

তারিক তারপর দুজনে কিভাবে খোঁড়া শুরু করল আর কি সব আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস খুঁজে পেল। কি রকম রহস্যময় দালান মাটিতে বুজে আছে, কিভাবে একটার সাথে আরেকটার ভেতরে যোগাযোগ। কত কি যে আছে সেখানে কে জানে। শেষে বলল, জামশেদ চাচা কি রকম পাগলের মত হয়ে গেছেন জায়গাটা দেখার জন্যে। গুপ্তধন যদি খুঁজে ওরা নাও পায় জায়গাটা খুঁজে বের করার জন্যেই ওরা বিখ্যাত হয়ে যাবে রাতারাতি।

সব শুনে ওদের দম বন্ধ হয়ে গেল উত্তেজনায়।

সত্যি বলছিস তোরা?

সত্যি।

খোদার কসম?

খোদার কসম।

ঘর সুড়ঙ্গ, আর মূর্তি?

হুঁ।

মানুষের খুলি?

খুলি না হাড়, মানুষের না অন্যকিছুর কে জানে।

তোর কি মনে হয়, আছে গুপ্তধন?

কে জানে সেটা।

চল দেখে আসি।

মিঠুর সব সময়েই সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। তাই ও যখন রাতে একটার সময় কালাচিতা যেতে চাইল, দীপু বেশি অবাক হল না। কিন্তু যখন দেখল সবাই সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল তখন ও ভারি অবাক হয়ে গেল।

এখন যাবি? কালাচিতায়?

হ্যাঁ। অসুবিধে কি?

বাবু বলল, বাসা থেকে যখন পালিয়েছি একটু সকাল সকাল ফিরে গেলে কি আর কম মার খাব?

তাই বলে এখন? ইতস্তত: করে বলল, রাত একটা দুটার সময়?

রাতই তো ভাল কেউ থাকবে না।

তারিক একটা বড় হাই তুলে বলল, আমার বাজে ঘুম পাচ্ছে, আমি যেতে পারব না।

যাবি না মানে? আমরা রাত একটার সময় কষ্ট করে এসেছি আর তুই ঘুমাবি মানে?

দীপু বুঝতে পারল, এত উৎসাহ নষ্ট করা উচিত না। কাজেই তারিককে ঠেলে ঠুলে রাজি করিয়ে ওদের রওনা দিতে হল কালাচিতার দিকে।

রাতের বেলা গ্রামের রাস্তা ভারি অদ্ভুত। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, তার মাঝে উঁচু সড়ক এঁকেবেঁকে গেছে ধানখেতের মাঝে দিয়ে। সড়কে এক হাঁটু নরম ধুলো। দুপাশে নাম না জানা বড় বড় গাছ বাতাসে শিরশির করছে। আকাশে ছোট একটা চাঁদ আর হাজার হাজার তারা মিটমিট করছে। দূরে বহুদূরে গ্রামগুলো অন্ধকারে মিশে আছে। চারদিকে এত নির্জন, এত নীরব যে একটু একটু ভয় লেগে যায়।

কালাচিতা বেশ দূরে। কিন্তু হেঁটে ওদের খুব বেশি সময় লাগল না। পথে খুব বেশি লোকজনের সাথে দেখা হয়নি। যাদের সাথে দেখা হয়েছে সবাইকে বলেছে যাত্রা দেখতে যাচ্ছে। কেউ অবিশ্বাস করেনি, সত্যি নাকি খুব ভাল যাত্রা হচ্ছে এবারে।

কালাচিতা পৌঁছানোর আগে দীপু মোমবাতিটি জ্বালাতে নিষেধ করেছিল, অনেক দূর থেকে আলো দেখা যায়। ওরা সবাই মিলে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এসেছে। তারিকের ভীষণ সাপের ভয়। শীতকালে সাপ বের হয় না শোনার পরও বাঁ হাতে শক্ত করে তাবিজটা ধরে রাখল।

কালাচিতায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিকে এত নির্জন যে কেউ কথা বলে সেটা ভাঙার সাহস পাচ্ছিল না। কেন জানি ফিসফিস করে কথা বলছিল সবাই। একটু একটু বাতাস। তারিক সাবধানে মোমবাতি জ্বালাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দীপু খপ করে তারিকের হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, সাবধান —

কি?

চুপ একেবারে চুপ সবাই, একটা কথাও না।

সবাই চমকে উঠে কাছাকাছি সরে আসে। অন্ধকারে নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ভয় পাওয়া গলায় দীপু বলল, ঐদিকে তাকিয়ে দেখ।

সবাই তাকিয়ে দেখল, কালাচিতার ইটের ফাঁক দিয়ে খুব সরু একটা আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। ভেতরে কে যেন আছে!

সবাই ভয়ে কুঁকড়ে গেল। বাবু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, চল ফিরে যাই। আমার ভয় করছে।

রতন প্রায় কেঁদে দিয়ে ভাঙা গলায় কি বলল কেউ বুঝতে পারল না।

তারিক ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ একটা কথাও না। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমার গুপ্তধন চুরি করতে এসেছে কেউ, হারামজাদার মাথা গুঁড়ো করে ফেলব না।

তারপরেই পকেট থেকে চাকু বের করে সে খুলে ফেলল।

মাথা গরম করিস না, তারিক। কতজন আছে তুই কেমন করে জানিস?

আমি দেখে আসি।

না না না— বাবু প্রায় কেঁদে দিল।

ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না— তারিক সত্যি সত্যি রওনা দেয়।

দাঁড়া তারিক, দীপু ওকে থামানোর চেষ্টা করল, হঠাৎ করে কিছু করিস না। আজকেই আব্বা বলছিলেন এসব ব্যাপার চুরি করার জন্যে অনেক বড় বড় দল থাকে। মানুষ টানুষ খুন করে ফেলে এরা।

তারিক ভয় পাবার ছেলে না। বলল, আমি খুব সাবধানে যাব, দেখে আসি ব্যাপারটা কি। তোরা এখানে দাঁড়া, আমি যাব আর আসব।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারিক অন্ধকারে মিশে গেল ওদের সামনে।

অপেক্ষা করা খুব খারাপ ব্যাপার, ওরা প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার আর হুটোপুটি শুনতে পেল। এক সেকেন্ডের জন্যে একটা টর্চলাইট জ্বলে উঠে নিভে গেল, আর তারা সবাই দেখতে পেল কালো মতো একটা লোক তারিককে জাপটে ধরে ফেলেছে।

উঠে দৌড় মারার প্রবল ইচ্ছেটাকে জোর করে চেপে রেখে দীপু সবাইকে নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল। বুক ধ্বকধ্বক করে এত জোরে শব্দ করতে লাগল যে মনে হল সেই শব্দ শুনে বুঝি ওদেরও ধরতে লোকজন চলে আসবে।

মিনিট কয়েক লাগল ওদের ঠাণ্ডা হতে। দীপু ফিসফিস করে বলল, খুব সাবধানে একজন একজন করে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়। খবরদার একটুও শব্দ করবি না।

সবাই মিলে জঙ্গলের অনেক ভেতরে গিয়ে একত্র হতে বেশিক্ষণ লাগল না। ভয়ে সবার মুখ শুকিয়ে গেছে। নান্টু ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদতে শুরু করল অভ্যাস মত। বাবু ভাঙা গলায় বলল, তারিককে মেরে ফেলেনি তো?

ভয়টা দীপুরও হচ্ছিল, কিন্তু দূর করে দিল জোর করে। বলল, আরে ধেৎ।

তুইই না বললি, এরা মানুষ খুন করে ফেলে —

তাই বলে তারিককে কেন মারতে যাবে।

তাহলে ওরকম শব্দ হল কেন। নিশ্চয়ই চাকুটাকু মেরেছে।

দূর। হঠাৎ করে ধরেছে তাই চমকে উঠে ওরকম চিৎকার করেছে।

বলেছে তোকে। কি ঝামেলায় পড়লাম। তোর সাথে আসাই উচিত হয়নি?

রাগে দীপুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, কার কার মনে হচ্ছে আমার সাথে আসা উচিত হয়নি।

সবাই চুপ করে রইল। নান্টু শুধু গজগজ করে কি জানি বলল কেউ বুঝতে পারল না।

তারিক কি বিপদে পড়েছে কিছু জানি না। বেঁচে আছে না মেরে ফেলেছে সেটা পর্যন্ত জানি না আর তুই তোর নিজের কথা ভাবছিস, লজ্জা করে না?

ঠিক আছে, দীপু ঠাণ্ডা গলায় নান্টুকে বলল, তারিককে কিভাবে ছুটিয়ে আনব সেটা আমরা ঠিক করব। তুই বাসায় চলে যা— গিয়ে তোর আম্মার সাথে লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ গিয়ে। যা —

নান্টু লজ্জায় লাল হয়ে বলল, আমি কি তাই বললাম নাকি? আমি বলছিলাম—

দীপু বাধা দিয়ে বলল, ওসব আমি বুঝি না। তারিককে ছুটিয়ে আনার জন্যে এখানে থাকবি না বাসায় যাবি?

এখানে থাকব।

গুড।

দীপু খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে বলল, কি হচ্ছে না হচ্ছে জানার আগে আমরা কিছুই করতে পারব না।

জানবি কেমন করে।

কারো যাওয়া দরকার। তোরা তো চিনিস না জায়গাটা আমি ভাল করে চিনি। আমি যাই।

না, না, না, না— সবাই একসাথে বাধা দিল।

মিঠু বলল, তারিক তো তাই করতে গিয়ে বিপদে পড়ল।

কিন্তু কিছুই যদি না জানি তাহলে করব কি?

বোঝাই যাচ্ছে কেউ এসেছে মূর্তি চুরি করতে।

কতজন এসেছে তুই কেমন করে জানিস?

সাজ্জাদ বলল, পুলিসকে গিয়ে খবর দিলেই হয়।

কি বলবি তুই পুলিসকে?

দীপু বলল, সেটা জানার জন্যেই তো যাওয়া দরকার। কারা আছে, কয়জন আছে না জানলে পুলিসকে কি বলবি?

বাবু মাথা নেড়ে বলল, কি দরকার? তারিক বিপদে পড়েছে। এখন তাকে বাঁচানোর জন্যে আরেকজনের বিপদে পড়ার কোন মানে নাই।

তার মানে তারিককে বাঁচানোর চেষ্টা করব না? আর বিপদে পড়ব সেটা কে বলল, তারিক জানত না বাইরে কেউ আছে। তাই সোজা হেঁটে গিয়েছিল, আমি সাবধানে যাব।

কিন্তু —

এর মাঝে আর কোন কিন্তু নেই। দীপু গম্ভীর হয়ে আব্বার মুখে অনেকবার শোনা কথাটা বলল, যেটা করা দরকার সেটা করে ফেলতে হয়। আমি যাচ্ছি। ধরা পড়ব না, ভয় পাস না। খোদা না করুক যদি ধরা পড়ে যাই, দুজন কিংবা সবাই চলে গিয়ে পুলিসকে খবর দিবি। আর যদি ধরা না পড়ি ফিরে এসে একটা কিছু করা যাবে।

দীপু তার সাদা শার্টটা পাল্টে নান্টুর গায়ের সবুজ রংয়ের শার্টটা পরে নিল, তাহলে দূর থেকে দেখা যাবে না। রওনা দেবার আগে বলল, আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে, কেউ ভয় পাস নে।

সাজ্জাদ বলল, দাঁড়া একটু— দীপু দাঁড়াল। সাজ্জাদ তিনবার কুলহু আল্লাহু পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে দিল, যা, কোন ভয় নেই।

বরাবরই সাজ্জাদ ধার্মিক ছেলে, দীপু একটু হাসল খুশি হয়ে, তারপর রওনা দিল।

জঙ্গলের অনেক ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, হাতড়ে হাতড়ে কালাচিতার কাছে আসতেই ওর অনেক সময় লেগে গেল। ওর তারিকের মত সাপ নিয়ে বাড়াবাড়িতে ভয় নেই। তবুও জেনে শুনে একটা সাপের ঘাড়ে পা দিতে চায় না। শীতকালে নাকি সাপ বের হয় না। দীপু সেটা জানে কিন্তু কথা হল সাপেরা জানে তো যে শীতকালে তাদের বের হতে হয় না?

অন্ধকারে থেকে থেকে চোখ এখন সয়ে গেছে। কালাচিতার কাছাকাছি এসে ও জায়গাটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। ডান পাশ দিয়ে গেলে একটা ঢালু মত জায়গা পাওয়া যায়, কাটা গাছ আর জঙ্গলে ভরা, তবে সেটা কালাচিতার খুব কাছে। তারিক আর সে ঠিক করেছিল কিছু ইট সরিয়ে এদিকে একটা দরজা তৈরি করবে। ওখানে হাজির হতে পারলে ভেতরে কি হচ্ছে শোনা যেতে পারে। দীপু কিভাবে যাবে ঠিক করে নিল। সোজা সামনের ঝোপটার দিকে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে যাবে। বাইরে কেউ পাহারা দিচ্ছে নিশ্চয়ই, কিন্তু দীপু তাকে খুঁজে পেল না।

দীপুর প্রায় হার্টফেল করার মত অবস্থা হল যখন সে আবিষ্কার করল যে সে যে ঝোপটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি একটি মানুষ, মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। ঘাড়ে বন্দুক না লাঠি সে বুঝতে পারল না। একটুও শব্দ না করে ও আবার আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসতে থাকে। ভাগ্যিস ঠিক তক্ষুনি লোকটি একটি সিগারেট ধরিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে থাকে। ম্যাচ জ্বলতেই ও লোকটিকে দেখতে পেল, কালো এবং শুকনো। ঘাড়ে যে জিনিসটি সেটি বন্দুক তাও স্পষ্ট দেখতে পেল।

পিছিয়ে এসে সে অন্যদিক দিয়ে ঢালটার কাছে হাজির হল। কান লাগিয়েও সে কিছু শুনতে পেল না, একটু টুকটাক শব্দ হচ্ছে কে জানে কিসের জন্যে। হঠাৎ ভেতরে কে কথা বলে উঠল, বল আর কে আছে তোর সাথে?

দীপু তারিকের গলার স্বর শুনতে পেল, আর কেউ নাই।

তোর সাথে যে আরেকটা ছেলে থাকে, ও কোথায়?

দীপু বুঝতে পারল তার কথা বলছে।

অনেকক্ষণ কোন কথা শোনা গেল না, তারপর ভারি গলায় একজন কি বলে উঠল। কথা শুনে মনে হয় বিদেশী। দীপু বেশি অবাক হল না, বিদেশীরা নাকি এসব চুরি করে বেড়াচ্ছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সব জিনিস নাকি চুরি করা।

দীপু কান পেতে কয়জন লোক কি করছে শোনার চেষ্টা করল। কমপক্ষে চারজন লোক আছে ভেতরে। ওরা আর বেশিক্ষণ থাকবে না, কি একটা খুঁড়ে বের করছে। ওটা বের করা মাত্রই প্যাকেট করে পালাবে। দীপু তারিকের সাথে থাকতে পারে তাই সন্দেহ করে এই তাড়াহুড়া। দীপু বুঝতে পারল, তাড়াতাড়ি ওদের কিছু করতে হবে, ওরা পালানোর আগে। তারিক ভাল আছে, কিছু হয়নি এটা চিন্তা করেই তার বুকের বোঝাটা চলে গেছে!

যত সাবধানে দীপু এসেছিল তার থেকে অনেক বেশি সাবধানে দীপু ফিরে এল।

সবাই ওর জন্যে অস্থির হয়ে বসেছিল, দেরি দেখে অনেকে সন্দেহ করছিল হয়ত সেও ধরা পড়ে গেছে। ফিরে আসতে দেখে ওদের খুশির সীমা থাকল না। তারিকের কিছু হয়নি শুনে উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল সবার। দীপু খুব তাড়াতাড়ি অল্প কথায় সব বুঝিয়ে দিল। ওরা বেশিক্ষণ থাকবে না, যা-ই করতে হয় খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। একবার চলে গেলে আর ধরা যাবে না।

সাজ্জাদ বলল, কাউকে গিয়ে থানায় খবর দিয়ে আসতে হবে।

হ্যাঁ, কিন্তু থানা কতদূর জানিস? গিয়ে ফিরে আসতে আসতে ওরা সবাই হাওয়া হয়ে যাবে।

তাহলে?

দীপু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, একটা খুব ভাল উপায় আছে।

কি?

বাইরে যে লোকটা পাহারা দিচ্ছে ওকে ধরে ওর বন্দুকটা কেড়ে নিই, তাহলে সবাইকে ভেতরে আটকে ফেলা যাবে। কালাচিতা থেকে বের হবার রাস্তা মোটে একটা, ওখানে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে থাকলে কেউ বের হতে পারবে না।

দীপুর কথা শুনে কারো কারো হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বাবু দুর্বল গলায় বলল, যদি গুলি করে দেয়?

ওকে গুলি করার সুযোগ কে দেবে? আমরা পেছন থেকে একসাথে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। প্রথমেই বন্দুকটা কেড়ে নিতে হবে। তারপরে ওকে বেঁধে ফেলতে কতক্ষণ!

যদি দেখে ফেলে।

সেটুকু ঝুঁকি নিক্ষ তো নিতেই হবে, চেষ্টা করা হবে যেন না দেখে। সবাই খুব আস্তে আস্তে লোকটার কাছাকাছি চলে যাব। তারপর যেই মিঠু শেয়ালের ডাক দেবে তক্ষুনি মনে মনে এক দুই তিন গুনে একসাথে লাফ দিতে হবে।

ঠিক। মিঠুর বুদ্ধিটা খুব পছন্দ হয়ে যায়। আমি সামনের দিকে থাকব, শেয়ালের ডাক শুনেই লোকটা একটু চমকে উঠে আমার দিকে তাকাবে আর অমনিই সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বি।

হ্যাঁ, দীপু আরো ছোটখাট ব্যাপার ঠিক করে নেয়, বন্দুকটা খুব সাবধান, নলটা সবসময় উপরের দিকে রাখতে হবে যেন গুলি বেরিয়ে গেলেও কারো ক্ষতি না হয়। আর সবচেয়ে যেটা জরুরী সেটা হচ্ছে মিঠুর শেয়ালের ডাকের পর মনে মনে এক দুই তিন গুনে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সবাইকে। কারো যদি ভয় থাকে আগেই বলে দে। আছে কারো?

না।

গুড। কেউ যদি ঠিক সেই সময়ে ঝাঁপিয়ে না পড়িস তাহলে কিন্তু কি হবে কিছু বলা যাবে না।

যদি মনে কর কাউকে দেখে ফেলল?

তাহলে তুই পাথরের মত চুপ করে শুয়ে থাকবি। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে না নেয়া পর্যন্ত নড়বি না। আর যদি লোকটা একেবারে ভাল করে দেখে ফেলে তাহলে ভাল মানুষের মত দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি ও তারিককে দেখেছে কি না, এইসব। অন্যেরা ঠিকই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সবাই মাথা নাড়ল। বুদ্ধিটা খারাপ না।

লোকটাকে বাঁধার জন্যে দড়ি নেই তাই শার্টগুলো খুলে পাকিয়ে দড়ির মত করে নেয়া হল। শীতের রাত, কিন্তু উত্তেজনায় কেউ শীতটুকু টের পাচ্ছে না। রওনা দেবার আগে সাজ্জাদ সবার বুকে কুলহু আল্লাহ পড়ে ফুঁ দিয়ে দিল।

জঙ্গল থেকে ওরা সাবধানে বের হয়ে এল। মিঠু চলে গেল লোকটার সামনের দিকে, অন্যেরা পেছনে। তারপর খুব আস্তে আস্তে লোকটাকে ঘিরে ওরা এগিয়ে আসতে থাকে। দীপুর শুধু ভয় হচ্ছিল মিঠু না আবার বেশি আগে শেয়ালের ডাক দিয়ে দেয়। ওকে অবিশ্যি বলে দেয়া হয়েছে, একটু পরে হলেও ক্ষতি নেই, আগে যেন না দেয়।

সবাই লোকটার হাত দুয়েকের ভেতর পৌঁছে যাবার পর থামল। দীপু মাথা তুলে দেখল সবাই এসে গেছে গুড়ি মেরে বসে অপেক্ষা করছে শেয়ালের ডাকের জন্যে। উত্তেজনায় বুক ধ্বকধ্বক করছে এক একজনের। কখন দূরে শেয়ালের ডাক শুনবে।

ঠিক তক্ষুনি ওরা শুনল কোথায় জানি শেয়াল ডেকে উঠল। মিঠু তার জীবনের সবচেয়ে ভাল ডাকটি দিল এবার। সবাই দেখল। লোকটি চমকে উঠল তারপর আবার ঠাণ্ডা হয়ে বসে রইল। ওরা মনে মনে গুনল এক, দুই, তিন— তারপর একসাথে গুলির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল নয়টি ছেলে।

যত কঠিন হবে ভেবেছিল তার থেকে অনেক সহজ হল ব্যাপারটা। টান মেরে লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল সবাই, হেঁচকা টানে বন্দুকটা কেড়ে নিল দীপু। মিঠু চিৎকার করে বলল, খবরদার একটু নড়লেই জবাই করে ফেলব!

লোকটি এত ভয় পেয়েছিল যে বলার নয়, এত জোরে চিৎকার করে উঠেছিল যে দীপুর মনে হল হয়ত মরেই গেছে। দীপু বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল, সাবধান! ওকে ভাল করে বেঁধে ফেল, আমি যাচ্ছি।

দীপু ছুটে গেল কালাচিতার গর্তের মুখে। ভেতরে কে কি করছে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু চিৎকার শুনে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বের হয়ে আসবে, তাহলেই বিপদ হয়ে যাবে। দীপু সেজন্যেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছে এখানে। গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, হ্যাণ্ডস আপ সবারই। বের হতে চেষ্টা করলেই গুলি করে খুলি ফুটো করে দেব।

ভেতর থেকে তারিকের আনন্দধ্বনি শোনা গেল, সাবাস দীপু কা বাচ্চা। জিন্দাবাদ।

ঘাবড়াস না তারিক। তোকে এক্ষুনি ছুটিয়ে আনব। পাহাবাদারকে বেঁধে ফেলেছি লাট্টুর মত। ওদের দোনালা বন্দুকটা এখন আমার কাছে, কেউ বের হতে চাইলেই গুলি।

দীপু খুব ভুল বলেনি। লোকটাকে সবাই বেঁধে ফেলেছে তক্তার মত। ধরাধরি করে নিয়ে আসছিল সবাই। মিঠু ক্রমাগত শাসিয়ে যাচ্ছে, যদি একটু নড়ার চেষ্টা করে তাহলেই নাকি জবাই করে ফেলবে। কি দিয়ে কে জানে?

দীপু চিৎকার করে বলল, নিয়ে আয় বান্দাকে এখানে। ভেতরে ফেলে দিই! সবাই এক জায়গায় থাকুক।

সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কালাচিতার ভেতরে লোকটাকে এভাবে ফেলা খুব সহজ হবে না, কিন্তু সব দিক দিয়ে নিরাপদ। বাঁধন খুলে ফেললেও বের হতে পারবে না।

দীপু চিৎকার করে বলল, গর্তের মুখ থেকে সরে যা তারিক, ভেতরে লাট্টু ফেলবো।

ঠিক হায়। ছোড় দো লাট্টু কো।

বেশি খুশি হলে তারিক বরাবরই উর্দুতে কথা বলে। ওরা সবাই ধরাধরি করে লোকটাকে গর্তের মুখে এনে ছেড়ে দিল। কিভাবে পড়ল সে নিয়ে মাথা ঘামাল না, এমন কিছু উঁচু নয়, একটু ব্যথা পেতে পারে, হাত পা ভাঙবে না।

এবারে মইটা বের করে আনব, তাহলেই সব শেষ। দীপু হাসিমুখে মইটা টেনে ধরতেই নিচে থেকে বিদেশীটা ইংরেজিতে কি যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল, সাথে সাথে ক্লিক করে একটা শব্দ হল আর তারিকের ভয় পাওয়া চিৎকার শোনা গেল।

দীপু ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তারিক?

পিস্তল। কাছে আসিস না খবরদার, গুঁড়ো করে দেবে।

দীপু টের পেল ভয়ে তার মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা কি একটা যেন বয়ে গেল। এটা সে চিন্তা করেনি। ভয়ে ওর সব চিন্তা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল। এখন মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে বিপদ হয়ে যাবে। ওদের পক্ষে ব্যাপারটা সামলানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে, বড় মানুষ দরকার, থানায় খবর দিতে হবে।

ফিসফিস করে বলল, বিলু এক দৌড়ে তুই থানায় যা, সর্বনাশ হয়ে যাবে এছাড়া।

বিলু মাথা নেড়ে বলল, থানার লোকজন যদি আমার কথা না শোনে?

শুনবে না মানে? শুনতে হবে। না হয় আমার আব্বাকে ডেকে নিয়ে যাস।

আচ্ছা। দীপুর আব্বাকে ওদের ক্লাসের সবাই চেনে, অনেকের সাথে খুব ভাল খাতির পর্যন্ত আছে। তিন চার বার ওর আব্বার সাথে ওরা মাছ ধরতে গিয়েছিল সংলা বিলে।

আর কে যাবে বিলুর সাথে?

আর কারো যেতে হবে না, দেরি হয়ে যাবে তাহলে। ঘাবড়াস না তোরা, আমি যাব আর আসব, বলে বিলু চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যি সত্যি বিলুর সাথে আর কেউ গেলে দেরি হয়ে যেত। বিলু এত দৌড়াতে পারে যে বিশ্বাস করা যায় না। গত স্বাধীনতা দিবসে কুড়ি মাইল ম্যারাথন দৌড়ে বিলু নাম দিয়েছিল কাউকে না বলে। স্টেডিয়ামে যখন ওরা দেখল ঘেমে টেমে লাল হয়ে খালি পায়ে কুড়ি মাইল দৌড়ে হাজির হয়ে গেছে বিলু। ওরা এত অবাক হয়েছিল যে বলার নয়। এসেছিল অবিশ্যি সবার শেষে, কিন্তু কুড়ি মাইল তো আর ঠাট্টা নয়। ডেপুটি কমিশনার নিজে তাকে একটা গোল্ড মেডেল দিয়েছিলেন।

নিচে খুব উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওরা কিছু বুঝতে পারছিল না। তারিকও কিছু বলছে না, কি হচ্ছে না হচ্ছে কে জানে। দীপুর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল ভয়ে।

নিচের হৈ চৈ হঠাৎ থেমে গেল। পরিষ্কার বাংলায় একজন কথা বলে উঠল, উপরে যারা আছো শোন। এই সাহেব খুব ক্ষেপে গেছে, দশ পর্যন্ত গোনার আগে বন্দুকটা নিচে ফেলে দাও, এছাড়া তোমাদের এই বন্ধুটিকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

মুহূর্তে সবার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দীপু কিছু চিন্তা করতে পারছিল না, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। শুধু মনে হচ্ছিল ওর জন্যেই বুঝি তারিক মারা পড়তে যাচ্ছে। নিজেকে নিজে বোঝাল, মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মাথা ঠাণ্ডা রাখ।

ওয়ান —

নিচে থেকে সাহেবের ভারি গলা শুনে ওপরের ওরা সবাই চমকে উঠে। বাবু ভাঙা গলায় বলল, দীপু বন্দুকটা ফেলে দে। তাড়াতাড়ি।

টু —

তাড়াতাড়ি ফেল দীপু— বাবু এবারে একেবারে কেঁদে দিল।

দীপু তাড়াতাড়ি চিন্তা করার চেষ্টা করল, বন্দুকটা ফেলে দিলেই ওদের সব ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দশ পর্যন্ত গোনার আগেই বন্দুকটা ফেলে দিতেই হবে। হয়ত তারিককে মারবে না, শুধু ভয় দেখাচ্ছে কিন্তু জানের ঝুঁকি তো কখনো নেয়া যাবে না।

তবু একটা চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

থ্রী!

দীপু গলা পরিষ্কার করে বলল, শোন! তোমরা আসলে আমাদের ভয় দেখাচ্ছ। তারিককে মারলে পালাতে পারবে কোনদিন এখান থেকে? পুলিস এসে ক্যাক করে ধরবে, তারপর একেবারে ফাঁসি?

সাহেবটি ইংরেজিতে কি বলল, বোধকরি জানতে চাইল দীপু কি বলছে। সাথের লোকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতেই সাহেবটি আবার রেগেমেগে কি যেন বলল। লোকটি তখন বাংলায় বলল, সাহেব জিজ্ঞেস করছে, তোমরা কি দেখতে চাও খামোকা ভয় দেখাচ্ছে না সত্যি বলছে?

দীপু তাড়াতাড়ি বলল, না।

তাহলে বন্দুকটা ফেলে দাও।

ফেলছি, তার আগে আমাদের কথা শোন।

কোন কথা শুনব না, বন্দুকটা ফেল।

শুনতে হবে।

শুনব না।

শুনতে হবে, শুনতে হবে, শুনতে হবে, দীপু চিৎকার করে বলল, শুনতে হবে, এ ছাড়া বন্দুক ফেলব না।

নিচে থেকে লোকটি বলল, কি বলবে?

তোমরা জান যে তোমরা আটকা পড়ে গেছ। তোমরা এও জান যে তোমাদের বের হবার আর কোন রাস্তা নেই। তারিককে যদি মেরে ফেল আমরা কোনদিন তোমাদের ছাড়ব না, পুলিস ডেকে আনতে মোটে ঘন্টাখানেক লাগবে তারপর সবার ফাঁসি হয়ে যাবে। তবে মুশকিল হল কি জান? তোমরা বুঝে গেছ তারিককে মেরে ফেলার ভয় দেখালে আমরা তোমাদের ছেড়ে দেবই। বন্দুক জান নিয়ে তো আর খেলতে পারি না—

সাহেবটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেয়া পর্যন্ত দীপুর থামতে হল। সাহেবটি গব গব করে বলল, ও ভয় টয় দেখাচ্ছে না, একটু দেরি হলে ও সত্যি গুলি করে দেবে।

দীপু বলল, শুধুশুধু ভয় দেখাচ্ছ তোমরা। আসলে কোনদিনও তোমরা গুলি করবে না, গুলি করলে উল্টো তোমাদেরই ফাঁসি হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমাদের কথা শোন আমরা তোমাদের চলে যেতে দেব।

কি কথা?

শুনবে তাহলে?

বল আগে।

দীপুর মুখে একগাল হাসি খেলে গেল। ওদের আটকে রাখার জন্যে এখন একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প বের করতে হবে। যদি সে বলে তারিককে ছেড়ে দিলে ওরা বন্দুক দিয়ে দেবে তাহলে এরা রাজি হবে যাবে, কিন্তু ওদের বিশ্বাস নাও করতে পারে। বলবে ঠিক আছে বন্দুকটা আগে দাও! এমন একটা কিছু বলতে হবে যেন বিশ্বাস করে। কি বলতে পারে? কি? কি?

ঠিক তক্ষুনি ওর মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল, টাকা! টাকা চাইতে হবে!

আমাদের দশ হাজার টাকা দাও, ছেড়ে দেব।

কি? দশ হাজার টাকা। লোকটা হাসির মত শব্দ করল।

দীপুর নিজেরই একটু লজ্জা লাগছিল বলতে, কিন্তু ও জানে শুধু টাকার কথা বললেই ওদের আটকে রাখা যাবে। পৃথিবীতে অনেক মানুষই টাকাকে খুব ভাল করে চেনে।

ঠিক আছে, দীপু বলল, দশ হাজার দিতে না চাও পাঁচ হাজার দাও। তোমরা তো বিদেশে এই মূর্তি বিক্রি করে লাখ টাকা পাবে, আমাদের পাঁচ হাজার দাও।

ফাজলামি পেয়েছ? এক্ষুনি বন্দুকটা ফেলে দাও, না হয় সাহেব গুলি করে দেবে।

দীপু একটু আহত স্বরে বলল, তুমি একটু বলেই দেখ না সাহেবকে সাহেব কি বলে।

অনেকক্ষণ কথা হল সাহেবের সাথে লোকটার। দীপুর একটু আশা হচ্ছিল হয়ত তাদের বিশ্বাস করতেও পারে। সত্যি সত্যি ওদের বিশ্বাস করল, ভাবল সত্যিই টাকা পেলেই বুঝি ছেড়ে দেবে। লোকটা বলল, সাহেব রাজি হয়েছে একশো টাকা দেবে বলেছে।

দীপু হাসি আটকে রেখে বলল, একশো টাকা। এটা কি চিংড়ি মাছের বাজার, যে দরদাম করছো? পাঁচ হাজার টাকার এক পয়সা কম না।

দীপু বুঝতে পারছিল না কতক্ষণ সে এইভাবে দরদাম করে যাবে। বিরক্ত হয়ে যদি গুলি করে বসে? পুলিস আসতে আর কত দেরি কে জানে।

দীপু খুব ঠাণ্ডা মাথায় আবার কথা বলা শুরু করল। দেখ, একটু পরেই সূর্য উঠে যাবে, তখন তোমাদেরই পালাতে অসুবিধা হবে। রাজি হয়ে যাও, তোমাদের ভাল, আমাদেরও ভাল। আমরা কাউকে বলব না পর্যন্ত।

আমাদের কাছে এত টাকা নেই।

কত আছে?

দু তিন শ।

আর কিছু নেই?

না।

ঘড়ি, ক্যামেরা? দীপুর নিজের উপরে ঘেন্না হচ্ছিল এভাবে কথা বলতে, কিন্তু না বলে করবে কি, ওদের বোঝাতেই হবে টাকা জিনিসপত্র পেলেই ওরা খুশি।

না, আর কিছু নেই।

কি বলছ, নিশ্চয়ই সাহেবের হাতে ঘড়ি আছে।

দেয়া যাবে না।

দিয়ে দাও না, সাহেব আরেকটা কিনে নেবে।

সবাই অবাক হয়ে দীপুকে দেখছিল। সে যে এরকম করে কথা বলতে পারে কে জানত। নেহায়েত দীপুকে খুব ভাল করে চেনে, এছাড়া বিশ্বাস করে ফেলতো দীপু সত্যি টাকার জন্যে এরকম করছে।

লোকগুলো রাজি হোক দীপু চাচ্ছিল না, কিন্তু রাজি হয়ে গেল। বন্দুকটা ফেলে দিলেই ওরা তারিকের হাতে টাকা আর ঘড়ি দিয়ে উপরে পাঠিয়ে দেবে।

দীপু রাজি হল না, উঁহু বিশ্বাস করি না। বন্দুকটা ফেলে দিলে তোমরা শুধু তারিককে ছেড়ে দেবে, টাকা দেবে না।

বলছি দেব।

দেবে না।

বললাম তো দেব।

বিশ্বাস করি না। আগে টাকা দিয়ে তারিককে পাঠাও আমরা বন্দুক ফেলে দেব, কথা দিলাম।

সাহেব রেগেমেগে কি যেন বলল, তখন দীপু আরেকটু নরম হল। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, দুজনের কথাই থাক। তারিক উঠে আসবে একপাশ দিয়ে, আরেকপাশ দিয়ে বন্দুকটা নামাব।

দীপুকে নিরাশ করে দিয়ে ওরা রাজি হয়ে গেল। এতেই ওর খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তখনো সে চিন্তা করে যাচ্ছিল এর থেকে ভাল কিছু করা যায় কি না। তক্ষুনি তার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি খেলে গেল, কিন্তু একটু সময় দরকার। সময়টা কিভাবে পাবে? চিৎকার করে বলল, তারিক টাকা না গুনে নিস না, আর আসার সময় আমাদের শার্টগুলো নিয়ে আসিস, শীতে মারা যাচ্ছি।

তারিক বলল, আচ্ছা।

দীপু সবাইকে একপাশে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, কেউ একজন একটা ইট নিয়ে আয় বড় দেখে। আর রাশেদ তুই ধর বন্দুকটা — আস্তে আস্তে নামাবি। কিন্তু খবরদার কেউ যেন ছুঁতে না পারে। আর সবাই শোন, আমি এই ইটটা লোকটার মাথায় ছেড়ে দেয়া মাত্র সবাই মিলে তারিককে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে আনবি, আর রাশেদও বন্দুকটা টেনে নিবি। খবরদার তারিক আর বন্দুক দুইটাই যেন আসে।

অন্য সময় কখনো ওরা এ ধরনের ব্যাপারে রাজি হত না। কিন্তু এতক্ষণ দীপু এত সব কাজকর্ম করেছে যে সবাই দীপুর উপর পুরোপুরি বিশ্বাস এনে ফেলেছে। কেউ আর আপত্তি করল না রাজি হয়ে গেল।

তারিক নিচে থেকে বলল, তিনশ পুরা নাই। দুইশ আশি টাকা আছে।

দীপু বিরক্ত হবার ভান করে বলল, ঠিক আছে, তাই আন। কি আর করব।

নিচে থেকে লোকটা বলল, বন্দুকটা নামাও।

রাশেদ সাবধানে বন্দুকের নলটা একটু নামাল, অমনি নিচে থেকে লোকটা চিৎকার করে উঠল, ওকি? গুলি করবে নাকি? উল্টো করে নামাও। রাশেদ বিব্রত হয়ে উল্টো করেই নামাতে লাগল।

দীপু হাতে বড়সড় একটা ইট নিয়ে জিজ্ঞেস করল, তারিক উঠছিস?

হ্যাঁ। এই উঠলাম এক পা। এই আরেক পা।

রাশেদও বন্দুকটা নামাচ্ছে আস্তে আস্তে। তারিককে এখনো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু উত্তেজনায় সবার বুক ধ্বকধ্বক করছে, শেষ পর্যন্ত সব ঠিক ঠিক হবে যাবে তো?

আস্তে আস্তে তারিকের মাথা দেখা গেল। বাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করে থাকতে বলল, তারিক বুঝে গেল কি হচ্ছে। সারা শরীর ওর টান টান হয়ে গেল সাথে সাথে। আরেকটু বের হতেই সবাই ওর শরীরের নানান জায়গা খামচে ধরল। তারিক চোখ টিপে বলল, আমার পা ধরে রেখেছে, বন্দুকটা ছেড়ে দে এবারে।

দিচ্ছি, বলে, দীপু আন্দাজ করে ইটটা ছেড়ে দিল।

নিচে থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনার সাথে সাথে রাশেদ বন্দুকটা আর অন্য সবাই তারিককে হ্যাচকা টান মেরে উপরে তুলে আনল।

দীপু চিৎকার করে বলল, খবরদার কেউ যদি বের হতে চেষ্টা কর গুলি করে ঘিলু বের করে ফেলব।

নিচে থেকে গোঙানোর মত একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু কেউ বের হবার চেষ্টা করল না। তারিকের পেটের ছাল ঘষা খেয়ে খানিকটা উঠে গেছে। কিন্তু সেরকম কিছু না, সে দীপুর পাশে বসে পড়ে বলল, সাবধান দীপু, সাহেব কিন্তু সাংঘাতিক, ভয় লাগে দেখলে। তোরা সবাই হাতে ইট নিয়ে দাঁড়া, কেউ বের হতে চাইলেই—

নিচে থেকে সাহেবের প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। রেগেমেগে কি যেন বলছে। হঠাৎ দুটি গুলির শব্দ বের হল ভেতর থেকে, ছিটকে সরে গেল দূরে সবাই। নন্টু আবার কান্না কান্না হয়ে যাচ্ছিল তারিকের ধমক খেয়ে সামলে নিল তাড়াতাড়ি। সবাই বেশ কয়টা করে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি রাখল হাতের কাছে।

দীপু যদিও ভয় দেখাচ্ছিল যে কেউ বের হতে চেষ্টা করলেই গুলি করে খুলি ফুটো করে দেবে কিন্তু ও খুব ভাল করে জানে যে কেউ যদি সত্যি বের হয়ে আসত ও কখনো গুলি করতে পারত না। ঢিল জমা করে তৈরি হবার পর ও অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারল, গুলি করার থেকে ঢিল মারা অনেক সোজা।

তারিক ফিসফিস করে বলল, পুলিসকে খবর দিতে পাঠাবি না? আমি যাব?

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল তারিককে, আস্তে আস্তে বলল, পাঠিয়েছি এদের শুনিয়ে কাজ নেই তাহলে বের হবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়বে।

তারিক একগাল হেসে তার পেটের ছাল ওঠা জায়গাটায় হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলল, ছাল উঠে গেছে শালার।

ফেঁসে যে যাসনি —

ঠিক বলেছিস। শালার যা ভয় পেয়েছিলাম। বাসায় গিয়েই ফকিরকে পয়সা দেব।

হঠাৎ করে ফুটো থেকে একটা মাথা অল্প একটু বের হল, অন্ধকারে বোঝা যায় না দেশী না বিদেশী, কিন্তু কেউ একজন যে বের হতে চেষ্টা করছে তাতে সন্দেহ নেই।

মার মার করে দশজনের অন্তত দশ ইট ছুটে গেল আর লোকটা চিৎকার করে ভেতরে ঢুকে গেল। গলা শুনে বোঝা গেল বিদেশীটা শেষ চেষ্টা করেছে।

দীপু চিৎকার করে বলল, কেউ বের হতে চেষ্টা করলেই এই অবস্থা হবে। মিঠু সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বলল, ট্রাই এগেন অ্যান্ড উই উইল ব্রেক ইওর হেড উইথ ঢেলা।

রাইট। সবাই খুশিতে চিৎকার করে উঠল, ব্রেক দা হেড, ব্রেক দা হেড, ব্রেক দা হেড!

ভেতর থেকে একটা গালির আরেকটা গুলির শব্দ শোনা গেল। নিশ্চয়ই ওপর দিকে গুলি করছে, কিন্তু লাভ কি।

দীপু স্ফূর্তিতে চুপ করে বসে থাকতে পারছিল না। বার বার তাকাচ্ছিল পুলিস আসছে কি না দেখতে। পুলিস এসে গেলেই নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু বুদ্ধি করে, প্রথমেই ওর আব্বার কাছে গেলে হয়।

ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে দীপু বুঝতে পারল সকাল হয়ে আসছে। ওর সাহস বেড়ে গেল সাথে সাথে একশো গুণ। রাত শেষ হয়ে গেলেই বুঝি সাহস বেড়ে যায়। দীপুর মজা করার ইচ্ছে হল একটু। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, মূর্তি চোরারা তোমাদের বাড়ি কোথায়?

ভেতর থেকে কোন উত্তর এল না। তারিক বলল, ভয় করছে নাকি?

ভয় না ভয় না, লজ্জা।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ভেতর থেকে হঠাৎ লোকটি ভাঙা গলায় কথা বলে উঠল, কি চাও তোমরা? কি জন্যে আটকে রেখেছ আমাদের?

মিঠু বলল, কাবাব বানাব তোমাদের।

বাবু সাথে সাথে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিল, থিফ ফ্রাই।

ইয়েস উই উইল মেক থিফ ফ্রাই অ্যান্ড ইট উইথ পটেটো।

হো হো করে সবাই আবার হেসে উঠল। হাসি থামার সাথে সাথে শুনল, লোকটি বলছে, আমাদের বের হতে দাও, তোমরা যা চাইবে তাই দেব।

সত্যি?

সত্যি।

বেশ তাহলে একজন একজন করে পা উপর দিকে তুলে বের হয়ে আস।

সবাই আবার হেসে ওঠে। অল্পতেই এক‌েকজন কেন জানি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল।

দীপু চেঁচিয়ে বলল, শোন মূর্তি চোরারা। তোমার সাহেবকে বলে দাও, পুলিস আসার পর তোমাদের টাকায় থু থু দিয়ে তোমাদের মুখে ছুঁড়ে দেব —

পুলিস। ভিতর থেকে লোকটার কাতর গলার স্বর শোনা গেল প্লীজ, পুলিসকে খবর দিও না।

ঠিক তক্ষুনি দূরে একটা জীপের শব্দ শোনা গেল। এই গ্রামের রাস্তায় গাড়ি খুব একটা আসে না, কারো বুঝতে বাকি রইল না পুলিস আসছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল দীপু, মূর্তি চোরারা, শুনতে পাও?

কি?

পুলিসের গাড়ির শব্দ? আধ ঘণ্টা আগে লোক চলে গেছে পুলিস ডাকতে, এতক্ষণ মশকরা করছিলাম তোমাদের সাথে।

শালারা ভাবছে টাকার জন্যে। বেকুব কোথাকার— বলে তারিক টাকার বাণ্ডিল থেকে একটা দশ টাকার নোট সরিয়ে ফেলল। থুথু মেরে ফেরৎ দেয়ার সময় দশ টাকা

কম দিলে এমন আর কি ক্ষতি হবে।

খানিকক্ষণের ভেতরেই জায়গাটা পুলিসে ভরে গেল। বিলু দীপুর আব্বাকে নিয়েই থানায় গিয়েছিল। পুলিস ইন্সপেক্টরের সাথে দীপুর আব্বাও এসেছেন। ওদের মুখে সব শুনে পুলিস ইন্সপেক্টর রিভলবার হাতে নিয়ে কালাচিতার মুখে দাঁড়িয়ে এমন চিৎকার করে ধমক দিল যে সুড়সুড় করে সবাই হাত তুলে বের হয়ে এল। বিদেশীটার মাথার বিভিন্ন জায়গা ফুলে ঢোল হয়ে আছে। যে লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল তার কপাল ফেটে রক্ত বের হচ্ছে। দীপুর ইটের জন্যে সম্ভবত। পোশাক দেখে ওদের তাক লেগে গেল। গলায় টাই পর্যন্ত আছে।

সকাল হয়ে আসছে, আবছা আলোয় চারদিকে এত হৈ চৈ লোকজন, সব কেমন অবাস্তব মনে হয় দীপুর কাছে। সব ভালয় ভালয় শেষ হল তাহলে। সারা রাত জেগে আছে কিন্তু ঘুম পাচ্ছে না কারো। নান্টুর শুধু শরীর খারাপ হয়ে গেল। বমি করে ফেলল কেন জানি। ওকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল জীপে। হঠাৎ করে ওরা সবাই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে।

দীপুর ওর আব্বার সামনে যেতে একটু ভয় লাগছিল। আস্তে আস্তে সাহস করে গিয়ে বলল, আব্বা —

কি?

তুমি কি রাগ করেছ আমার উপর?

আব্বা আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, হলেই আর কি লাভ। তুই কি আমার কথা শুনিস কখনো। কারো যদি কিছু হত?

দীপু মাথা নিচু করে বলল, হয়নি তো।

হুঁ। হয়নি। আচ্ছা যা, রাগ করিনি।

সত্যি?

সত্যি। আব্বা ওর মাথায় হাত রাখলেন। হঠাৎ করে মনে হল তার দীপু অনেক বড় হয়ে গেছে। কেন জানি আবার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন আস্তে আস্তে।

রাতে বাসা থেকে পালিয়েছিল বলে সেবারে আর কারো মার খেতে হয়নি। খবরের কাগজে পরের দিনই সব বের হয়েছিল। ওরা হাসিমুখে বসে আছে, পেছনে হাতকড়া লাগানো মূর্তি চোরের দলের ছবি। খুব হৈ চৈ হল কয়দিন। জামশেদ সাহেব তার দলবল নিয়ে জায়গাটা খোঁজাখুঁড়ি শুরু করে দিলেন। আব্বার সাথে দেখা হলেই বলতেন তারিক আর দীপু খুঁড়তে চেষ্টা করে জায়গাটার কি কি ক্ষতি করেছে। ওরা যে বের করে দিল সেটি যেন কিছু না।

দীপু ওর আব্বাকে তারিকের কথা আর তার আম্মার কথা খুলে বলল —

কালাচিতা হাতছাড়া হবার পর তারিকের দিকে তাকানো যায় না। ওখানে গুপ্তধন পাবে সেরকম আশাও আর নেই। আব্বা সব শুনে-টুনে কয়দিন কি যেন করলেন, কোথায় কোথায় চিঠি লিখলেন, কার কার সাথে কথা বললেন। তারপর একদিন তারিককে ডাকিয়ে এনে তার একটা ছবি তুলে নিলেন। দীপু কিছু বুঝতে পারছিল না, আব্বাকে জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ নেই। জিজ্ঞেস করলেই বলেন, উঁহু, বলা যাবে না, টপ সিক্রেট।

টপ সিক্রেট আর বেশিদিন টপ সিক্রেট থাকল না। একদিন খবরের কাগজ খুলেই দীপু অবাক হয়ে দেখল প্রথম পৃষ্ঠাতেই তারিকের ছবি? নিচে লেখা, খুদে নৃতত্ত্ববিদ পুরস্কৃত। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল দীপু— মৌর্য সভ্যতার একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খুঁজে বের করেছে বলে বাংলাদেশ সরকার তারিককে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছে। তারিকের এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্যে জায়গাটার নাম তারিকের দেয়া কালাচিতাই থাকবে। চিৎকার করে উঠে মুখ না ধুয়েই খবরের কাগজ হাতে খালি পায়ে দীপু ছুটে বেরিয়ে পড়ল। তারিককে খবরটা সেই প্রথমে দিতে চায়।

তিন মাইল রাস্তা ছুটে যাওয়া সোজা কথা নয়: তারিকের বাসায় গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তারিককে ডেকে বের করে আনল।

তারিক ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে রে দীপু?

দীপু খবরের কাগজটা ওর সামনে খুলে ধরল।

পুরোটা পড়তে পারল না তারিক, তার আগেই দীপুকে ধরে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলল। মানুষ খুশি হলে কেন যে কাঁদে কে জানে, দীপু অবাক হয়ে নিজের চোখও মুছে নেয় সাবধানে।

অনেকদিন পার হয়ে গেছে। বছর ঘুরে শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। ফাইনাল পরীক্ষার দেরি নেই আর। আব্বা আবার ছটফট করছেন, মন বসছে না আর তার এখানে। দীপুকে তাগাদা দেন শুধু।

কত দেরি তোর?

কিসের?

পরীক্ষার। শেষ কর তাড়াতাড়ি, যাব অন্য জায়গায়।

কোথায় যাবে আব্বা?

ঠিক করিনি এখনও। পাহাড়ের কাছে কাছে। রাঙ্গামাটি না হয় বান্দরবন।

দীপু পড়ায় আর মন দিতে পারে না, বই খুলে রেখে বসে থাকে আর ওর চোখের সামনে দিয়ে সব ভেসে যায়। মাত্র একবছর আগে এসেছিল এখানে, অথচ মনে হয় কতকাল পার হয়ে গেছে। কত কি হল এখানে — স্কুলে, খেলার মাঠে, কালাচিতায়। কত বন্ধুরা আছে এখানে। কত ঝগড়া, মারামারি আবার মিটমাট হয়ে হৈ চৈ, চেঁচামেচি, ফুটবল খেলা। দীপু ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তাকে চলে

খেতে হবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, ওর বন্ধুরা যখন শুনবে কি বলবে তারা? তারিক নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে। ওর আম্মা নাকি ভাল হয়ে যাচ্ছেন, কয়দিন থেকেই তারিক বলছে ওর আম্মা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই ও দাওয়াত করে খাওয়াবে দীপুকে। ওর আম্মা নাকি খুব ভাল রাঁধতে পারেন।

দীপু নিশ্চয়ই আসবে এখানে আবার। নিশ্চয়ই আসবে।